একটি খারাপ মেয়ের গল্প

কবিতা সিংহ

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
অনাদিনাথ কুমার
উমাশঙ্কর প্রেস
১২, গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
তিতান ভট্টাচার্য

আমার অভিন্নহৃদয় বান্ধবী
চিত্রা মল্লিক-কে

অলকাকে আমি প্রথম দেখি যেদিন রুমা আমাকে পরিত্যাগ করে।

এক একটা দিন আমাদের জীবনে কি রকম যেন হয় না? সমান সাইজের দিনগুলো থেকে বেঢপ উঠে এসে ছমদাম ফাট্‌তে থাকে।

রুমা যেদিন ওর বাবার সঙ্গে রাজধানী একস্‌প্রেসে দিল্লী চলে যায়, আমার সেই উনিশ বছরের জীবনে সে দিনটাও অমনি ছিল। চোখ বুজে আজও যখন সেই দিনটির কথা ভাবি আমার মনে কত যে সব ছবি, ছবির পর ছবি ভিড় করে আসে।

সবার আগে আমার মনে পড়ে যায় রুমার মায়ের কথা। ম্লান আর ছুঃখী কল্যাণী মাসিমার সেই মুখখানি। আবছা আর সুদূর।

রুমারা যখন তাদের ছিম্‌ছাম্ স্যুটকেস আর হোল্ডঅল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, রুমার মা তখন দরজার মুখে দাঁড়িয়ে। তাঁর ঠোঁটে মৃছ হাসি। ফ্ল্যাটবাড়ির দরজার পাশে বেমানান যাত্রালক্ষণ জলের ছোট্ট পূর্ণঘট, দেবতার নির্মাল্য। রুমা আর রুমার বাবা আর পিছন ফিরে তাকায় নি দ্রুতবেগে নীচে নেমে গিয়েছিল। আমি তাকিয়েছিলাম। দরজার পাল্লা ধরে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়েছিলেন মাসীমা। মুখে হাসি নেই। বোধ হয় একছিটে রক্তও নেই।

আমি রুমা আর রুমার বাবার সঙ্গে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

জীবনে সেই প্রথম আমার রাজধানী একস্‌প্রেস্ দেখা। আমার সেই উনিশ বছরের মধ্যবিত্ত জীবনে, থার্ডক্লাশ ছাড়া আর কোনো রকম গাড়িই আমি চড়ি নি।

আমার কাছে রেলগাড়ি চড়ার স্মৃতি মানেই ভিড়, ঘামের গন্ধ, লাইজল, পেচ্ছাপ, মেঝেয় থুতু, এইসব।

হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, রুমাদের সঙ্গে রাজধানী একস্‌প্রেসের প্ল্যাট্‌ফরমে এসে, ওই রকম নিয়নজ্বলা, সান্‌গ্লস দেওয়া, এয়ার-কণ্ডিশনড্‌ কার্পেট টার্পেট মোড়া ব্যাপার স্যাপার দেখে আমার মতো হাভাতে ছেলে একটু থতমত খেয়ে যাবে না ত কী?

লম্বা, দীর্ঘ পর্দা ঢাকা জানলার রাজধানী একস্‌প্রেস্‌। এর যাত্রীদের চেহারা আর আদবকায়দাই আলাদা। কেউ হাতে একটা হাল্কা হ্যাণ্ডব্যাগ আর একটা নরম ফোমের বালিশ হাল্কা 'রাগে' জড়িয়ে দিল্লী চলেছে। রুমা বলেছিল, ওরা ওইভাবেই যায়। একটা রাত পেরোলেই দিল্লী। এয়ারকণ্ডিশনড্‌ ট্রেন থেকে নেমে বাড়ির গাড়ি, তারপর আবার একটা এয়ারকণ্ডিশনড্‌ রুমে গিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়া।

হ্যাঁ আমি, সূর্য রায় প্ল্যাট্‌ফর্মে রুমার পাশে পাশে, না, যেন রুমার পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। কোনো কারণ ছিল না ঘুরে বেড়ানোর। তবুও ঘুরছিলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম রুমার সঙ্গে আমার যা হবার তা হয়ে গেছে। আর নতুন কিছু ঘটবে না। সব শেষ। তবু, কিছুতেই শেষ টানটা কাটাতে পারছিলাম না। উনিশ বছর বয়স কিনা। তখনও মনের কোথাও, কোনো কোণে রূপকথায় একটা আস্থা, একটা কেমন বিশ্বাস যেন থেকে যায়। আমিও আশা করেছিলাম। ভেবেছিলাম, হয়ত, শেষ মুহূর্তে একটা অদ্ভুত কিছু ঘটে যেতে পারে।

কারণ রুমাই যে তখন আমার জীবনে প্রথম। আমি রুমাকে পেরিয়ে আর কাউকে, আর কিছুকেই নিজের বলে ভাবার স্বপ্নও দেখতে পারতাম না।

রুমার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মনে হয়েছিল, কিন্তু রুমা আমার প্রায় সমবয়সী হলেও, এসব ব্যাপারে ঠিক আমার মতো কি?

কত সহজেই ওরা স্মৃতিকে বিলিয়ে দিতে পারে, বিকিয়ে দিতে পারে।

এই ত কদিন আগেই, ওরা ওদের বাড়ির সব জিনিসপত্র নীলামে বেচে দিল। আমাদের শ্যামবাজার এরিয়ায় ও ধরনের ফিরিঙ্গিপনা সেই প্রথম।

রুমা বলেছিল, বদলির চাকরির নাকি অমনিতর রীতি। ওর বাবার কোলিগ্‌রা নাকি বদলির সময়ে কোনো রকম পিছুটান রেখে যান না।

তা ছাড়া এত বড় প্রমোশনে যাচ্ছেন রুমার বাবা। রুমার বাবার এখন অন্য স্ট্যাটাস্‌। আরো অনেক বড় পোস্টে জয়েন করছেন দিল্লীতে। কে ল্যাজে বেঁধে নিয়ে যাবে ওই সব অকেজো ব্যাক্‌ডেটেড্‌ ফার্নিচার! যতসব দাগ লাগানো, চটাওঠা মিনিফ্রিজ্‌, বাজে ডিজাইনের ইংলিশ খাট, স্টীলের আলমারি। ওসব দিল্লীতে একেবারেই চলবে না।

রুমার মা কিন্তু খুব নীচু গলায় অন্য কথা বলেছিলেন।

জানো সূর্য, এই জোড়াখাট আমার প্রথম মাইনের টাকায় কেনা। পুরোনো আসবাবের সেলে ঘুরে ঘুরে আমাদের বিয়ের পরের মাসেই কিনেছিলাম। কি মমতায় হাত বোলাচ্ছিলেন কল্যাণী মাসিমা কালো পালিশ করা খাটের গায়ে। এই আলমারিটার রঙ ছিল 'গ্রে'—আমি ঘরের লেমন ডিস্‌টেম্পারের সঙ্গে মিলিয়ে এটাকে লেমন স্প্রে-পেন্টিং করিয়েছিলাম। রুমার মা সেই ধুলো পড়া, জড়ো করা আসবাবগুলোর চারপাশে ঠিক প্ল্যাট্‌ফরমে বিনা কারণে ঘুরে বেড়ানো আমার মতো, সব ফুরিয়ে গেছে জেনেও ভূতগ্রস্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

সে বড় করুণ দৃশ্য। একটা সাজানো বাগান থেকে মৌসুমী ফুলের গাছগুলোকে শেকড় থেকে উপড়ে ফেলে জড়ো করে রাখলে যেমন হয়। একটা সাজানো সংসারের গোছানো ঠিকঠাক জায়গা থেকে সরিয়ে এনে জড়ো করে রাখা আসবাবগুলোকে ঠিক তেমনি স্মৃতির রক্তমাখা মরা শ্রীহীন খণ্ডের মতো লাগছিল।

সেই সব আসবাব বেচে রুমা আর রুমার বাবা দামী পোশাক আর

হাল ফ্যাশানী লাগেজ কিনেছে। আধুনিক সব স্যুটকেস হোল্ডঅল্, হ্যাণ্ডব্যাগ্! আমি এমন সব জিনিসপত্র আগে কখনো দেখি নি।

রুমাদের জিনিসপত্র যখন সেল্ হচ্ছিল, আমি রুমাকে বোকার মতো প্রশ্ন করেছিলাম, 'রুমা, মাসিমা তো আপাতত কলকাতাতেই থাকছেন তবে তোমরা সব ঝেঁটিয়ে বিক্রি করে দিয়ে যাচ্ছ কেন? মাসিমারও ত কিছু কিছু জিনিসপত্র লাগবে।'

রুমা তার চড়ুইরঙা চোখ দুটি নাচিয়ে বলেছিল,

—তুমি ত আচ্ছা বোকা ছেলে সূর্য! জিনিসপত্র না বেচলে আমার আর বাবার এই সব নতুন নতুন জিনিস কেনার টাকা কোথা থেকে আসত? তাছাড়া মা ত এই ফ্ল্যাট্‌টা রাখছে না। বাবার এক বন্ধুকে এটা দিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মা হয়ত ছোটখাটো কোনো ঘর ভাড়া নেবে, কিংবা স্কুলের হস্টেলে চলে যাবে।

—মাসিমা দিল্লী কবে যাবেন?

আমি আবার বোকার মতো প্রশ্ন করেছিলাম।

—মা যখনই চাইবে, তখনি!

কাঁধ নাচিয়ে কেমন তাচ্ছিল্য তাচ্ছিল্য করে বলেছিল রুমা,

—ওই ত হেটুরে স্কুল, আর ওই ত চাকরি, তার জন্য আবার কত মায়া।

আমার কিন্তু রুমার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল রুমার মা খুব শিগগির দিল্লী যাচ্ছেন না। ওরা বাবা আর মেয়েতে মিলে কেবল মুঠো মুঠো মিথ্যা কথা বলে, আমাদের সবাইকে ব্লাফ্ দিয়ে যাচ্ছে।

কদিন আগেই তো রুমা আমাকে বলেছিল,

—জানো সূর্য বাবার এবারের বদলির ব্যাপারে মা যেন কেমন আশ্চর্য ব্যবহার করছে। এর আগে মা কিন্তু এমনটা করে নি। আমার আবছা মনে আছে, বাবা যখন পুণায় বদলি হয়ে যায়, মা তখন কি আনন্দ করে সংসার পাততে গিয়েছিল বাবার সঙ্গে। জানো সূর্য তখন

মা বাবার চেয়েও ভালো চাকরি করত। কলকাতার একটা সরকারী কলেজে প্রফেসারী করত। লোকের কাছে রীতিমতো গর্ব করে বলার মতো চাকরি। সেই চাকরি ছেড়ে মা বাবার সঙ্গে থাকার জন্য পুণায় চলে যেতে পেরেছিল। তারপর আবার যখন কলকাতায় ফিরে আসা হল তখন মা আর ভালো কোনো চাকরি না পেয়ে একটা বাজে স্কুল-টিচারি নিল। কোনো মানে হয়? বলো? বাবার একটা প্রেস্‌টিজ্‌ বলে আছে তো?

সত্যি। আমি রুমাকে অঙ্ক বুঝিয়ে দেবার জন্য মাঝে মাঝে ওদের ফ্ল্যাটে যেতাম। রুমার বাবা প্রায়ই সন্ধ্যেবেলা তাঁর বন্ধুবান্ধব নিয়ে ওঁদের বেড্‌ কাম্‌ ড্রইংরুমে আড্ডা বসাতেন। কস্‌মোপলিটন্‌ আড্ডা। অনেক বিদেশী অবাঙালী বন্ধু বান্ধবী থাকত। আর থাকত রুমার এয়ার হোস্টেস্‌ মিলিপিসি। দারুণ দেখতে ছিল মিলি দত্ত। ছিপ্‌ছিপে বেতের মতো চেহারা। নাভির তলায় শাড়ি পরতো। দোকানে করানো কায়দার চুল। খুব ছট্‌ফটে চাল-চলন, আর ফুর-ফুরে কথা বলার ভঙ্গি।

বিলিতি মদের ফোয়ারা ছুটতো, রেকর্ডে বাজত বিলিতি গান। কখনো কখনো ফুর্তির চোটে ঘর ফেটে পড়লে সারা দলটা গাড়িতে, স্কুটারে চলে যেত বাইরে। না হলে রুমাকে পড়াতে পড়াতে দেখতাম কল্যাণী মাসিমা নিঃশব্দে ছোট কাপড়ের ব্যাগ্‌টি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

রুমা ঠোঁট কুঁচকে বলত,

—দেখেছ সূর্য মা বেরিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা ওই কি মায়ের বাইরে যাবার পোশাক হল? ছি ছি, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়। কি রকম বাজে একটা লাটকরা আধ ময়লা শাড়ি।

আমি বলতাম,

—মানে তোমাদের ঘর কম তো? মাসিমা আর কতক্ষণই বা রান্নাঘরে বসে থাকবেন? অসুবিধা হয় তো?

—বাঃ, মা পার্টিতে জয়েন করলেই তো পারে? বাবাকে কম্পানি দিতে পারে।

আমার কিন্তু খুব অস্বাভাবিক লাগত। মাসিমা ওই মদের পার্টিতে ওই হই হুল্লোড়ে যোগ দিচ্ছেন, এ কথা তাঁর মেয়ে ভাবতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে ভাবা সম্ভব নয়। আমি ভাবতে পারি না।

রুমা ক্রুদ্ধ হয়ে বলত,

—আজকাল লক্ষ্য করছি, মা বাবার বন্ধুবান্ধব, বাবার উন্নতি এসব কিছুই স্ট্যাণ্ড করতে পারে না। মা আজকাল যেন কেমন বুড়িয়ে যাচ্ছে। শুখিয়ে যাচ্ছে। তুমি লক্ষ্য করেছ কিনা জানি না, বাবার পাশে কিন্তু মাকে আজকাল একেবারেই মানায় না।

অবশ্য রুমার এ কথাটা সত্যিই।

ওর বাবাকে ওর মায়ের চেয়ে অনেক বেশি কমবয়সী, বেশ যুবক যুবক লাগত। লম্বা ছিপ্‌ছিপে, ব্রাউন গায়ের রঙ। আর দারুণ স্মার্ট। চমৎকার টেরিলিনের শার্ট পরতেন তিনি। টাট্‌কা আর নিভাঁজ। আর প্যারালাল ঘেঁষা প্যাণ্ট। সম্প্রতি আবার চুলের ফ্যাশান পাল্টে বেশ কবি কবি ভাব করেছেন। লম্বা জুল্‌পি রেখেছেন। লাল রঙের ঝক্‌ঝকে একটা স্কুটারে চড়ে সাঁ সাঁ করে যান আসেন। মাঝে মাঝে আবার ওঁকে আঁকড়ে ধরে আসে মিলি দত্ত। যার দেওয়া ক্যাড্‌বেরি চকলেট্ আমরা দুজনে অর্থাৎ রুমা আর আমি ভাগ করে খেতাম। আমার মনে হত আমি যেন রঙীন বিজ্ঞাপনের ফিলম্ দেখছি। সে বিজ্ঞাপন স্কুটারেরও হতে পারে, শাড়িরও কিংবা টেরিলিন শার্টের বা ফ্লেক্স জুতোর।

আমার তখন রুমার বাবাকে মেসোমশাই না বলে নীতিশদা বলে ডাকতে ইচ্ছে করত।

মাঝে মাঝে, পাড়ার মোড়ে ছেলেদের দঙ্গলের মধ্যে থাকলে,

—কি দাদা বেশ, চালাও পান্‌সি, বলে আওয়াজ দিতেও ইচ্ছে করত। রুমারা কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছিল সাত আট বছর আগে।

আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে ভাড়া আসবার আগে রুমারা পার্ক সার্কাসের দিকে থাকত।

বছর খানেক হল রুমারা এপাড়ায় আমাদের ঠিক পাশের ফ্ল্যাটে। মাস আস্টেক হল আমার সঙ্গে আলাপ। মাস চারেক হাবুডুবু প্রেম।

আমার বাবা তাঁর সওদাগরী অফিসের বড়বাবুর চাকরির অন্তিম-কালে যে মাইনেতে উঠেছেন রুমার দাদা-সদৃশ বাবা তাঁর চাকরির দশ বারো বছরের মধ্যেই প্রায় ততই মাইনে পেতেন। আমরা পাশাপাশি দুটি ফ্ল্যাটে থাকতাম। আমাদের ঘর-দোরের সংখ্যা আর মাপ একেবারে স্কোয়ার ফুট্ মিলিয়ে এক হলেও ভিতরের অবস্থা আর জীবনযাত্রায় একেবারে আকাশ-পাতাল ফারাক ছিল।

রুমার বাবা ওই দু ঘরের ফ্ল্যাটটিই দিব্যি কেমন ছিম্ছাম্ করে রাখতেন। ফ্রিজ্ গ্যাস্ প্রেশার-কুকার এসব ত ছিলই, তাছাড়া ছুতোর মিস্ত্রী ডেকে আরো নানারকম আধুনিক সব গার্হস্থ্য ব্যাপার স্যাপারও করে নিয়েছিলেন তিনি। তবে রুমার মা চিরকালই ছিলেন একটু ঢিলেঢালা প্রকৃতির। রুমার বাবা বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টার লোক রাখতেন না। একটি মাত্র ঠিকে ঝি দিয়েই সব চালাতে হত। তিনি স্কুল, বাড়ি সব একসঙ্গে ম্যানেজ করতে গিয়ে একেবারে হিমশিম খেয়ে যেতেন।

মাঝে মাঝে এই সব নিয়ে রুমার বাবার সঙ্গে খিটিমিটি লাগত তাঁর। রুমার বাবা নানা রকম অনুযোগ করতেন। চিৎকার করতেন। তারপর রেগে মেগে লাল স্কুটার হাঁকিয়ে বেরিয়ে যেতেন বাড়ি থেকে।

আর পাশের ঘরে রুমাকে অঙ্ক বোঝানোর ছল করতে করতে, আমি দরদর করে ঘামতে থাকতাম।

রুমা বিরক্ত হয়ে বলত,

—মা, না, স্ট্রেঞ্জ। বাবা বেরিয়ে গেল। দেখলে ত সূর্য। আসলে মা না আজকাল বাবার একটা কথাও সহ্য করতে পারে না। মায়ের

আসলে মিলিপিসি সম্বন্ধে দারুণ জেলাসি। অথচ মিলিপিসির চেষ্টা আর তদ্বিরেই ত বাবার প্রমোশনটা হচ্ছে!

অথচ প্রথম প্রথম যখন রুমারা আমাদের পাড়ায় এল, প্রথম প্রথম রুমাদের সঙ্গে আমার ভাবসাব হল তখন কিন্তু রুমা অন্যরকম কথা বলত। ওর বাবা যখন সন্ধ্যেবেলা বেরিয়ে যেতেন, রুমা বলত,

—কি অন্যায়, দেখো সূর্য, এই ত ডিউটি থেকে ফিরল বাবা, কোথায় একটু আমাদের সঙ্গে থাকবে, তা নয় বেরিয়ে পড়ল। বলো, মায়ের লোন্‌লি লাগে না?

সেদিন বিনা কারণে, অপ্রয়োজনে রুমার পাশে পাশে প্ল্যাট্‌ফর্মে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ মনে হয়েছিল আমার, রুমা যেন অনেকটা ওর বাবার মতো। মেথডিক্যাল, এম্বিশাস্ আর গুছুনে। হবেও বা। যে ভাবে নিজেদের মালপত্রের তদারকি করছিল রুমা, জিনিসপত্র সামলাচ্ছিল, সে একটা দেখবার মতো ব্যাপার।

আসলে সাদামাটা মধ্যবিত্ত বাঙালী বাড়ির ছেলে আমি। আমাদের বাড়ি লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়া হয়, সত্যনারায়ণের সিন্নি চড়ে, আমার মা বাড়িতে শাড়ি শেমিজেই চালিয়ে নেন। আমার বাবা বেনিয়ান পরে বাজার যান। তক্তপোষ আর কাঠের আলমারি, টেবিল ছাড়া আমাদের বাড়িতে বিশেষ আসবাব নেই। তাই রুমাদের নতুন ধরনের সংসার যাত্রা আমার কাছে একটা আশ্চর্য ঘটনা।

বরং রুমার স্মার্ট আর বাস্তব চাল চলন আমার কাছে দারুণ গর্বের ব্যাপার ছিল। রুমা যে আমার মায়ের মতো, আমার বৌদিদের মতো এলোথেলো বোকা সোকা নয়, কায়দা দুরস্ত, এটা যেন আমার একটা দারুণ জয়ের ব্যাপার। আমি যখন মাত্র ক হাত তফাতে, এধারের ফ্ল্যাটে আমার ভাইদের সঙ্গে ঢালাও তক্তপোষে শুয়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে আমার আর রুমার মিলিত জীবনের স্বপ্ন দেখতাম তখন অবধারিত রুমা আমার মনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসত তার নিজস্ব রূপে আর পরিবেশে।

আমি দেখতাম রুমা যেন ছাপা লিনেনের হাউসকোট পরে আমাদের ডানলোপিলোর গদি দেওয়া খাটের শাদা ধবধবে, দুধের ফেনার মতো নেটের মশারি তুলে সাটিনের লেপের তলায় শোওয়া আমার ঠোঁটের কাছে ধরে দিচ্ছে, ভোরবেলার প্রথম কফির ধোঁয়াওঠা পেয়ালা। ভাবা যায়, ওই সতের আঠারো বছর বয়সেই আমাদের শ্যামবাজার পাড়ার কোনো ছেলেমেয়ের যা ছিল না, রুমার তাই ছিল। তার নিজের জন্য আলাদা আস্ত একখানা ঘর।

সেই ঘর, রুমা দোকানের শো-কেসের মতো ঝকঝকে তকতকে করে সাজিয়ে রাখত।

মনে আছে সেদিন বিকেলে রুমাদের সি-অফ্ করতে এসে আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সমর্থ পুরুষদের অভ্যস্ত নিয়মে রুমাদের মালপত্র টানাটানি করতে গিয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ খেয়াল করলাম এ ব্যাপারে আমার প্রতিযোগী রুমার বাবার অফিসের আর্দালীরা। ফলে আমাকে বোকা বনে সরে আসতে হল।

সেদিন সব কিছু কিরকম যে অর্থহীন মনে হচ্ছিল। কি রকম যে বাজে খরচ বাজে খরচ। এই কি সেই রুমা? যাকে আমি মাঝে মাঝে অঙ্ক দেখিয়ে দেবার ছুতো করতাম। যে আমাকে গঙ্গার ধারের জলের ভিতরে নেমে যাওয়া ঝকঝকে রেস্তোরাঁ চিনিয়ে দিয়েছিল। কতদিন সেখানে সন্ধ্যের রঙীন আলোয় গঙ্গা দেখতে দেখতে আমরা হট্-ডগ্ আর কফি খেয়েছি। এই রুমার সঙ্গেই কি আমি আলিপুরের হর্টিকালচারাল গার্ডেনে, ভিক্টোরিয়ায় ঘনিষ্ঠ হয়ে হাতে হাত দিয়ে বেড়িয়েছি?

আজ তারই পাশে বরখাস্ত হয়ে যাওয়া একটা চাকরের মতো হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম আমি। অর্থহীন।

রুমার সেই দৃপ্ত ভঙ্গিটি, যা সেদিনের পর আর কোনোদিন দেখি নি আমি, এখনও আমার চোখে ভাসছে। রুমা হাঁটছে। কাঁধে তার এক অদ্ভুত গড়নের ফ্লাস্ক্, হাতে একটা বড় হ্যাণ্ডব্যাগ্। স্কোয়ার। আসল

লেদারের। ব্যাগ্‌টা আমাকে দেখিয়ে রুমা বলেছিল এটাই নাকি লেটেস্ট। বুঝিয়েছিল—এর ফিনিশ্‌ দেখেছ। এটাই হল আসল খাঁটি। অবশ্য এর অনেক চিপ্‌ নকল পাবে, নিউমার্কেটে। আমি অবাক হয়ে রুমার ঠোঁট নড়া দেখছিলাম। রুমার পরনে একটা কমলা রঙের নতুন ফতুয়া আর কালো স্ল্যাক্‌স্‌। গলায় পেন্‌ডেন্টের বদলে চেনে ঝুলছে একটা নতুন ঘড়ি। দামী গোল সোনার চাক্‌তির মতো দেখতে। রুমা কেবল দিল্লীর কথা বলছিল। রুমার চোখ দেখে মনে হচ্ছিল; রুমা যেন দিল্লী দেখতে পাচ্ছে। সে তার বাবারও আগে, রাজধানী এক্‌স-প্রেসেরও আগে দিল্লী চলে গেছে।

আমি সেদিন ভেবেছিলাম, এই লাস্ট চান্স্‌। রুমাকে কতকগুলো মোদ্দা কথা জিজ্ঞেস করে নেব কি না?

কিন্তু দুঃখের বিষয় রোজকার মতো সেদিনও সত্যিই রুমার সামনে আমার বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারেই খুলছিল না।

রুমাকে দেখলেই আসলে আমার কেমন যেন একটা ঘোর লাগত। মাঝে মাঝে রুমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে, ওর পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে আমার এমনও মনে হয়েছে, যে আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। কারণ রুমার চোখ মুখ বুক আর শরীর ছিল নিউমার্কেটের পাতলা কাগজের পর্দা দেওয়া বাক্সে রাখা পলিথিনের পুতুলের মতো নতুন। আমি তাই কখনো ওর দিকে খুব গভীর কোনো লোভের হাত বাড়াতে সাহস পাই নি। আমার কেমন যেন মনে হত রুমারও চারপাশে যেন সেলোফেনের একটা অদৃশ্য মোড়ক দেওয়া আছে। আমি হাত ছোঁয়ালেই বোধহয় শব্দ করে ছিঁড়ে যাবে। আর সেলোফেন ছিঁড়ে যাওয়ার শব্দ, চিরকালই আমার কাছে ভয়ঙ্কর বেদনাদায়ক।

আমার যখন বছর দশেক বয়স তখন আমি একবার আমার এক স্কুলের বন্ধুর বোনের জন্মদিনে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম। যদ্দূর মনে পড়ে, ওরা খুব বিলিতি কেতার পার্টি দিয়েছিল। খুব খাওয়াদাওয়া হৈ হুল্লোড়, উপহার টুপহার। আমি অসাবধানে সেই ছোট্ট মেয়েটির

উপহারের টেবিলে রাখা একটা বড় মেমপুতুলের বুকের ওপর নিজের অসাবধানে আমার হাতের তালুর চাপ দিয়ে ফেলেছিলাম। তাতে পুতুলের বুকটা বসে যায়। ভিতরে কোথাও, সাউণ্ড বক্স ফেটে গিয়ে একটা তীক্ষ্ণ, বিশ্রী শব্দ বেরিয়ে আসে। এবং আমার সেই মর্মান্তিক পুতুল হত্যা দেখে, বন্ধুর বোনটি ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে। সেই থেকেই আমার কেমন যেন ভয়।

তাই আমি রুমার খুব কাছে গিয়েও, সে যত চাইত ঠিক ততদূর পর্যন্ত যেতে পারতাম না। কিন্তু ওই যে, কতকগুলো প্রশ্ন আমার মাথার ভিতরে অদ্ভুত ভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াত।

যখন রুমার খুব কাছাকাছি থাকতাম না, আমার নিজের মধ্যে ধাতস্থ থাকতাম, যেমন বিকেল বেলা, পাড়ার পার্কে, একা একা বেড়াতে বেড়াতে, কিংবা কলেজের অধ্যাপকের লেকচার শুনতে শুনতে কিংবা বাড়িতে আমার মায়ের সামনে বসে আসনপিঁড়ি হয়ে ভাত খেতে খেতে, আমি বিভোর হয়ে ভাবতাম, রুমাকে আমার অতি অবশ্যই কিছু মোদ্দা প্রশ্ন করা উচিত। কি রকম প্রশ্ন? না, শুচি-অশুচি, নীতি দুর্নীতি, কিংবা সতীত্ব অসতীত্ব, এসব বিষয়ে তার নিজস্ব ধারণা কী?

কিন্তু সত্যি বলতে কি রুমার কাছাকাছি এলেই এই সব প্রশ্ন-গুলো কেমন ছোট, গুঁড়ো গুঁড়ো আর অকিঞ্চিৎকর হয়ে রুমার এই সবের বাইরের সেই অদ্ভুত একটা আলাদা বিরাট জগতে হারিয়ে যেত। সেখানে সব কিছু নতুন, লেটেস্ট, ইম্পোর্টেড। এবং তাদের ছোঁয়া ধরা মাখা পান করার বাড়তি দুরন্ত মজা।

রুমার ঘরটা আমার এত ভালো লাগত। একেবারেই আলাদা। রুমা দেওয়ালে সেঁটে রাখতো দামী বিলিতি সিনেমা পত্রিকা থেকে কাটা ব্লো-আপ্‌ ফটো। বিলিতি পপ্‌ সিঙ্গারদের ছবি। সারা ঘরে কত ঝক্‌ঝকে জিনিস। সাংহাই থেকে, হংকং থেকে জাকার্তা থেকে জাপান থেকে। তার উড়োপিসী মিলি দত্ত প্রেজেন্ট্‌ আনত, তার বাবা

আনতেন। সাংহাই-এর হাতপাখা, হংকঙের হাল্কা সোনার বরণ মেটালকেস। জাপানী ঘড়ি, ফরাসী পারফিউম্ ফরেন লিকারের সুদৃশ্য সব বোতল।

একটা কালো পেটমোটা মদের বোতলে রুমা ফুল রাখত। সেটার গায়ে, শাদা অক্ষরে লেখা ছিল VAT—69 পরে অবশ্য এমন বোতল আমি আরো দেখেছি। কিন্তু সেদিন প্রথম বোতলটার ওই পেটমোটা কালো কালো আকৃতি আর ওই অদ্ভুত ছুটো শব্দের ধ্বনি আমাকে খুব বিপর্যস্ত করেছিল। বার বার ভেতরে ভেতরে উচ্চারণ করছিলাম। যত-বারই উচ্চারণ করি ততবারই বাড়তি মজা। সত্যি অমন কালো বোতলে যে ম্যাজিক পানীয় থাকে, তার যেন ঠিক ওই নামটিই সাজে।

আমি অবশ্য বোকার মতো বলেছিলাম,

—ওই শাদা শব্দ ছুটো মুছে দিচ্ছ না কেন রুমা? তাহলে ত আর বোতল বলে বোঝা যাবে না। পুরো ফুলদানী মনে হবে।

—ভ্যাট্!

আমার গালে টোকা মেরেছিল রুমা।

—আরে ওটা রাখাই ত স্টাইল। ও তুমি বুঝবে না সূর্য, বুঝবে না।

সেই রুমা। *ঠিক যেন টিনের সেপাই আর নাচের পুতুলের গল্পের* মতো। মস্ত একটা আয়না যার হ্রদ, তার ধারে রঙীন রাঙ্তা মোড়া যার প্রাসাদ। সেই আয়নায় ছায়া ফেলে দাঁড়ানো লোভনীয় রঙীন নাচের পুতুল রুমা। আর আমি হঠাৎ জানলা দিয়ে নীচের জলস্রোতে পড়ে তলিয়ে হারিয়ে যাওয়া তার গুণমুগ্ধ, এক পা ভাঙা টিনের সৈনিক।

সেই রুমা যেদিন রাজধানী একস্‌প্রেসে দিল্লী চলে গেল সেদিনটা সত্যিই কি আলাদা আর অদ্ভুত ছিল।

কাঁটায় কাঁটায় ট্রেন ছাড়ল। আর তারই সঙ্গে সময় মিলিয়ে, ঠিক ক্যালকুলেটেড্ টাইমে ভিতরের আরামপ্রদ সীট থেকে বেরিয়ে

এসে, এক আঙুলে ফিলম ফেয়ারের ভাঁজে চিহ্ন রেখে, রুমা বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য তার বাবার পাশে এসে দাঁড়াল।

নীতিশবাবু একটু শুকনো পোষাকী হাসি হেসে বললেন,

—চলি ভাই।

রুমা বলল,

—বাই-ই!

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমার চারপাশে তখন রুমার বাবার বাড়ির আত্মীয়-স্বজন আর অফিসের লোকেদের ভিড় চাক ভাঙছে। আমি দিশেহারা হয়ে ভাবছি —কোন্‌টা চলছে, ট্রেনটা? না প্ল্যাট্‌ফর্ম?

সে সময়ে ভেবেছিলাম, আমার প্রথম ভালোবাসা, প্রথম স্বপ্ন, প্রথম ঘনিষ্ঠতা আমার বিশ্বভুবন হঠাৎ বিশ্বাসঘাতক খেলুড়ের মতো ভেঙে দিয়ে রুমা কেমন বিনা নোটিশে উঠে চলে গেল।

তখন, এবং তারপরেও যখন ওই ঘটনার কথা ভাবতাম, তখনি আমার চোখের সামনে সেই একটাই ছবি তৈরী হত। যেন একটা বালিয়াড়ী। যেন অনেকগুলো ছোট্ট ছোট্ট বালির ঘর। যেন হাফ্‌ প্যান্ট্‌ পরে, হাঁটু মুড়ে হতভম্ব হয়ে বসে আছি আমি। আর কেন জানি না সবুজ মিনি স্কার্ট পরে, একটা বালির বাড়িতে লাথি মেরে ভেঙে উঠে চলে যেতে থাকা রুমা। যার গম্বুজের মতো ছুটো মধুরঙা উরু, উরুর পেছন, আর আরো ওপরে ফ্রিল দেওয়া প্যান্টির শাদা লেশ্‌ পর্যন্ত যেন আমি দেখতে পাচ্ছি।

রুমাদের ট্রেন চলে যাবার পর সেদিন আমি হাঁটতে হাঁটতে কখন যেন হাওড়া ব্রীজ পেরিয়ে গিয়েছিলাম। দূরে সার সার নৌকার আলো, গঙ্গার পার্কার কুইঙ্ক কালির মতো ঘন কালো জল, হাওয়া আমাকে হঠাৎ যেন গঙ্গাকে নমস্কার করার কথা, রুমার মায়ের কথা মনে করিয়ে দিল।

আচ্ছা রুমার মা, কল্যাণী মাসিমা কেন দিল্লী গেলেন না। রুমা ত'

ওর মায়ের নিজের মেয়ে। ও কি করে মাকে ছেড়ে দিল্লী চলে গেল? ওর বাবার সঙ্গ নিয়ে অতদূরে গিয়ে ওর কি মাকে একবারও মনে পড়বে না?

রুমা সেদিন কোয়ালিটিতে কফি খেতে খেতে বলছিল,—দেখনি, আমার বাবা আর মায়ের মধ্যে কি রকম অমিল। চেহারায়, চরিত্রে, রুচিতে, এ্যাটিচ্যুডে, টেস্টে! আমি শূন্যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে রুমাকে দেখছিলাম।

মনে পড়ে যাচ্ছিল রুমা প্রায়ই ওর ঘরের আপাদমস্তক একটা আয়নার সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে ওকে চুমু খেতে বলত। আমরা যখন চুমু খেতাম রুমা বিহ্বল কণ্ঠে বলত,

—জানো সূর্য, We would make a nice pair. আমাদের দুজনের চেহারা এত মানানসই।

কিন্তু এত মানানসই হয়েই বা কি হল? সেই ত রুমা আমাকে ফেলে চলে গেল।

আসলে রুমার যদি কারো সঙ্গে সামান্যতমও মিল থাকে, তা ছিল তার বাবা নীতিশ সাহার সঙ্গে।

দুজনেই কেমন যেন কোন ভাবেই ওল্ড মডেলের কোনো রকম জিনিসই পছন্দ করতে পারত না।

মানুষও সম্ভবত ওদের কাছে, কেবল জিনিস বলেই পরিগণিত ছিল।

হাওড়া ব্রীজ থেকে সেদিন আর সিধে বাড়ি যাই নি।

হ্যারিসন রোডের ট্রাম ধরে সোজা চলে গিয়েছিলাম কফি-হাউসে। ভেবেছিলাম দু চারজন বন্ধু-বান্ধবকে পেয়ে যাবো। খানিকটা গল্প-গাছা করতে পারলে মনটা হাল্কা হয়ে যাবে। কিছুটা অন্যমনস্ক হতে পারব। কফি-হাউসে ঢুকে একটা একলা টেবিলে গিয়ে বসেছিলাম

এককাপ কফির অর্ডার দিয়ে। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে বাজী ধরছিলাম। দেখি বাই চানস্ কে প্রথম উঠে আসে আমার টেবিলের দিকে।

আমার ভাগ্যের জুয়ো খেলায় ঠিক সেদিনই উঠে এলো সোনা-রূপোর দোকানদারদের ছেলে সলিল নন্দী। সে আমাকে যেন আলাদীনের সেই প্রদীপের দৈত্যের মতো করেই প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গেল এই কলকাতা শহরেরই একটা আকাশছোঁয়া ফ্ল্যাটে। আর সেখানেই প্রথম অলকাকে দেখতে পেলাম।

তাহলে সলিল নন্দীর কথা আমাকে কিছুটা বলতেই হয়। আমরা স্কটিশচার্চের প্রথম বছরে ঢুকেছি। কো-এডুকেশনের মায়ায় তখনও শরীর মন আচ্ছন্ন। গুটি কেটে বেরিয়ে আসি নি বলে বাইরে বেপরোয়া ভাব দেখালেও ভেতরে ভেতরে কিন্তু কাঁচা আর লাজুক লাজুক। সেই সময় মোটা সোটা বোকা বোকা ভালোমানুষ টাইপের ধনী ঘরের ছেলে সলিল নন্দী প্রায়ই আমাদের বসন্ত কেবিনের কবিরাজী আর চা খাওয়াতো। একবার দারুণ প্রেমে পড়ে গিয়ে এ হেন সলিল হেদোর জলে আত্মহত্যাও করতে গিয়েছিল। তারপরই ওর বাবা আর কাকারা কলেজ থেকে ওর নাম কাটিয়ে নিয়ে ঘাড়ে ধরে দোকানে বসিয়ে দেয়। সলিল কফি-হাউসের রোজকার খদ্দের নয়। মাঝে মাঝে কোথা থেকে যেন উদয় হয় সলিল। আর যেদিন উদয় হয়, সেদিন সবাই জানে একটা দারুণ ব্যাপার ঘটবেই ঘটবে। আমার যদ্দূর মনে হয়, প্রায় ছ সাত মাস বাদে আমি সলিলকে কফি-হাউসে দেখলাম। দরজা দিয়ে ঢুকে সোজা আমার টেবিলের সামনে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলল,

—কিরে সূর্য, কেমন আছিস?

সলিলের কথার ভঙ্গিতে, হাসিতে আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম তার সেদিনের টার্গেট, আমি। আশেপাশের টেবিল থেকে চেনাশুনো সবাই কেমন আড়ে আড়ে চাইছিল আমার দিকে। মিটিমিটি হাসছিল। ভাবটা এই, আজকে সূর্যর বরাত খুলেছে। সূর্যকে সলিল আজ 'চিচিং-

ফাঁক' দেখাবে। আমি সলিলের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম,

—তোর কি খবর বল, তুই কেমন আছিস ?

সলিল পকেট থেকে ঝক্‌ঝকে সোনালী সিগারেট কেস বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে মেজাজের মাথায় একটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল,

—ভালোই আছি, নে।

আমার মাথায় তখন আগুন জ্বলতে আরম্ভ করেছে। সলিল কেন ওই সিগারেট কেসটা বের করতে গেল। রুমারও ঠিক অমনি একটা একটা সিগারেট কেস আছে। সলিল জানে না। অজান্তেই ও আমার স্মৃতিটা এমন ভাবে নাড়িয়ে দিল। আমি সিগারেটটা রিফিউজ করে ভ্রূ কুঁচকে রাগী রাগী গলায় বললাম,

—সলিল, শুনলাম তুই আজকাল খুব বাজে হয়ে গেছিস।

সলিল একটা কোল্ড্ কফির অর্ডার দিয়ে উরুতে চাপড় মেরে বলেছিল,

—যাঃ, ভুল শুনেছিস্, কুচুটে মেনীমুখোরা অমনি কত বলে। আসলে আমি আজকাল খুব কাজের হয়ে গেছি।

আমি গালে হাত দিয়ে পা দোলাতে দোলাতে বললাম,

—মানে ?

—মানে আসল রক্তের স্বাদ পেয়েছি।

আমি আবার বললাম,

—মানে ?

—মতলব, তোদের এই বার্লিগোলা কফি-হাউসী প্যানপ্যানানির বাইরে বেরিয়ে যেতে পেরেছি।

জানিস সূর্য, আমি এখন রীতিমত রেগুলার দোকানে বসি। দোকানে না বসলে আমার পেটের ভাত হজম হয় না। কষ্টি-পাথরে সোনা ঘষে আমি এখন পান মরার নিখুঁত পার্সেন্টেজ কষতে পারি। মুক্তো, পলা, হীরে, চুনী পান্নার কদর যাচাই করতে পারি। খদ্দেরকে

আমার দোকানে বেঁধে রাখতে পারি। খদ্দের ঠকাতে পারি। এই সূর্য তোর রাহু বক্রীরে, আমার দোকানে আয় না, একটা পাঁচরতির গোমেদের আঙ্‌টি করে দিই তোকে।

—আমার রাহুর কথা জানলি কি করে? তুই কি আজকাল হাত-টাত দেখছিস নাকি?

—নাঃ। তোর মুখ ত দেখছি। যেন কালি মেড়ে দিয়েছে।

আমি মিয়ানো গলায় বললাম,

—নে খামোখা বাজে বকিস না। কফি খা!

সলিল কোল্ড্‌ কফিতে চুমুক দিয়ে বলল,

—ধ্যেৎ একেবারে ভুল। আমার ভাই আজকাল আর এই নিরামিষ কফিতে কিচ্ছু হয় না। স্বাদ নেই আমোদ নেই। উল্টে বরং খামোখা রাত জাগিয়ে রেখে কষ্ট দেওয়া ছাড়া এই চোতা জিনিসে আর কোনো উপকার নেই। আসল মজা কাকে বলে বুঝতিস যদি দু পেগ নির্জলা হুইস্কি টানতে পারতিস। তোদের মতো ওই দুখানা খাতা হাতে করে হ্যাঁ ভাই, না ভাই, করতে আমার লজ্জা করে। আর ওই যতসব প্লেন্‌বুক, গালে ব্রন, চশমা নাকে কোমর ভাঙা 'দ' মেয়েগুলোর সঙ্গে খালি 'র‍্যাঁবো' আর 'বোদ্‌লেয়ার' কপ্‌চানো। ওফ্‌! আহা, ও সব ছেড়ে যদি আসল মেয়েছেলে কাকে বলে তার স্বাদ পেতিস।

আমি হাত ঝাড়া দিয়ে বললাম,

—তা তুমি শালা যখন আসলের স্বাদ পেয়েছো, তখন এই নকল জায়গায় মাঝে মাঝে মূর্তিমান অশান্তির মতো উদয় হও কেন?

সলিল পিছনে মাথা হেলিয়ে বলল,

—এই তোদের মতো বুড়ো খোকাদের ধুলো খেলা দেখতে আমার বেশ কেমন ফুর্তি লাগে।

আমি তখনই দেখেছিলাম, সলিলটাকে যেন লিলিপুটদের দেশে এসে তাদের দিকে কৌতূহল ভরে তাকিয়ে থাকা গালিভারের মতো লাগছে। সলিল একটু বেশি বয়েসেই পড়তে এসেছিল। কিন্তু

আমি লক্ষ্য করলাম সে যেন পুরোপুরি একটা পুরুষ বনে গেছে। ওর মুখে বুকে কাঁধে একটা উদ্ভাসিত আলো পড়ায় ওকে কেমন যেন রিয়েল রিয়েল লাগছে। ওর গাল এর মধ্যেই, কামানো খরখরে সবুজ। স্বাস্থ্য ভালো হওয়ার জন্যেই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক ওর দৃঢ় চোয়াল মুখখানি চমৎকার চরিত্রবান। অর্থাৎ চিবুকে, ঠোঁটে, দাঁতে কপালে কেমন একটা কঠিন আর বাস্তব পৌরুষ। সলিলকে দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল ও এই পৃথিবীর মোটমাট কতকগুলো জিনিসের বেশ ভালোরকম স্বাদ পেয়ে গেছে।

বোধ হয় সেই কারণই আমি আরো বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে গিয়ে বলেছিলাম,

—সলিল, আমি ভাই আজকে দারুণ অফ্ মুডে আছি। তোমার যদি গাহক সংগ্রহ করতে হয়, তুমি অন্য টেবিলে যাও।

সলিল থাবা বাড়িয়ে আমার কব্জি চেপে ধরেছিল।

—অফ্ মুডে আছিস্, আহঃ! আমি ত ঠিক তোর মতোই একজন অফ্ মুডের মক্কেল খুঁজছি। চল্ আজ মুড্ মেজাজ একটু জলবত্তরল করে আসা যাক্।

গাড়ির চাবিটা আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে আমাকে প্রায় টেনে তুলল সলিল।

—আমারও আজ অফ্ মুড্। একটা তেরো বছরের বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে সামনের মাসে আমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। কি করব বল। ও অনেক ডানা ঝটপটি করে দেখেছি ওতে কিছু হয় না। ফ্যামিলি ট্রাডিশন মানা ভালো বুঝলি। বড় বাজারে ওদের চারখানা বড় বড় সোনার দোকান।

আমি আর বিশেষ আপত্তি করলাম না। সলিলের সঙ্গে উঠে পড়লাম। আসলে আপত্তি করলেও ত বিশেষ ভালো দেখায় না। সেদিন কল্লোল বলছিল, কল্লোল আর শমীনকে নিয়ে সলিল নাকি কোন দামী বারে গিয়ে না হোক তিনশ টাকা খরচ করেছিল। সুখেনকে

নিয়ে গিয়েছিল রেসের মাঠে। গ্র্যাণ্ড্ স্ট্যাণ্ড না কি আছে, মানে সব চেয়ে দামী জায়গা থেকে ঘোড়দৌড় দেখিয়েছিল। কানুকে নিয়ে গিয়েছিল বম্বের ফিল্ম পাড়ায়, আশিসকে পুরীর বেস্ট্ হোটেলে নিয়ে রেখেছিল। সলিলের একস্পেন্সে খাবো দাবো, আর ফুর্তি করবো, অথচ এমন ভাব দেখাব যেন সলিলকেই উদ্ধার করে দিচ্ছি, ঠিক এতটা নির্লজ্জ হওয়া অন্তত আমার ধাতে পোষায় না। তা ছাড়া এই ত একটি দিন। সাধারণতঃ সলিল যাকে একবার স্বর্গ দেখায়, তাকে দ্বিতীয়বার আর ডাকে না। তার নতুন নতুন গ্রাহক চাই। অতএব সলিলের সোনালী রঙের স্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ডে উঠে আমার বেশ একটা ম্যাজিক্ কার্পেট কার্পেট ভাব হল। যেন যাদুর গাল্‌চেয় চড়ে উড়ে যাচ্ছি আরব্যরজনীর দেশে। গাড়িটাকে ঘুরিয়ে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে সলিল যে কখন সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউতে এনে ফেলল আমি যেন টেরই পেলাম না। ভিড় কাটিয়ে একটা ট্রাফিক ইশারায় একটু থতিয়ে সলিল বলল,

—এবার বল্, এতো অফ্ মুড্ কেন ?

আমি এবার সলিলের সিগারেট কেশ থেকে অবলীলায় একটা ফিলটার টিপ্ ধরিয়ে ধোঁায়া ছেড়ে বললাম,

—আমার একটা পার্টি আজ কলকাতা থেকে চলে গেল সলিল!

—কোথায় ?

—দিল্লীতে!

সলিল মাথা হেলিয়ে হেসে বলল,

—দিল্লী, মানে ত, ও পাড়ায়! আমি ভাবলাম বুঝি চাঁদে!

আমি কিছু বলছিলাম না। বলবার মতো ত আসলে কিছু নেইও। তবু রুমার চলে যাওয়াটা যেন একটা সভ্য জমে ওঠা খেলা, কিংবা সমে চড়ে ওঠা একটা তানের হঠাৎ ভেঙে যাওয়ার মতো থেমে যাওয়ার মতো বিশ্রী আর আধখেঁচড়া ব্যাপার হয়ে, আমার স্নায়ুতে লাগছিল।

সলিল চাপা গলায় বলল,

—এই ত, আমাদের পাড়ার একটা ছেলে এক বড় মান্নুষের, খুব বড় মান্নুষের মেয়েকে ভালোবেসেছিল। মেয়েটাকে ওর বাবা মা বিলেতে পাঠিয়ে দিল। দু বছর বাদে মেয়েটা বিলেত থেকে ফিরে এল। এসে শুনল ছেলেটা বম্বেয় চাকরি করছে। সেদিন রাতেই সোজা বম্বে চলে গেলো তারপর যথারীতি বিয়ে। দেখ সূর্য যা কিছু রিয়েল হয় তা ঠিক থেকে যায়। নষ্ট হয় না। দূরে, কাছে, বিচ্ছেদে মিলনে কিছুতেই কিছু এসে যায় না। ক্রমশঃ যত সময় যাবে এক্সপিরিয়েন্স্ বাড়বে, বুঝবি। এখন কপালে কষ্ট আছে। পেয়ে যা।

আমি তখন সলিলের কথা বুঝি নি। সলিলের আপ্তবাক্যগুলোর ভিতরে প্রবেশ করতে পারি নি। এখন বুঝছি। এই আমি। এই ছাব্বিশ বছরের সূর্য। এই কলেজ থেকে বেশ গুরুগম্ভীর ভাষায় যাকে বলে অধ্যাপনা, তাই সেরে ফিরে এসে এখন আমার এই গড়িয়ার নিজের তৈরী ছিমছাম বাংলো প্যাটার্ণের বাড়িটার সামনে ফাল্গুনের এই রঙীন বিকেলে চায়ে চুমুক দিতে দিতে, সবুজ ঘাসে ছাওয়া আমার এই মৌসুমী ফুলফোটা সাজানো বাগানখানি পরম শান্তিতে দেখতে দেখতে সেই সব দিনের কথা ভাবছি আর মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি সেদিন আমার চেয়ে বড়জোর দুতিন বছর বয়সের বড় সলিল কি নিদারুণ সত্যি কথাই না বলেছিল।

সেদিন সলিলের পাশাপাশি যেতে যেতে আবহাওয়াটা হাল্কা করবার জন্য বলেছিলাম,

—আজ শালা কোথায় খেপ্ মারছো?

—অদ্ভুত একটা জায়গায় নিয়ে যাবো তোকে। দারুণ জিনিস। এ সব ব্যাপার কলকাতায় প্রায় নতুন। পাগ্লা হয়ে যাবি। পার্ক স্ট্রীট দিয়ে তখন সলিলের গাড়ি যাচ্ছে। রাস্তাটার নাম কি যেন একটা প্লেস। দারুণ নির্জন। দু পাশে বড় বড় কম্পাউণ্ডওয়ালা সেই সাহেবীআমলের তৈরী বাড়ি। মাঝে মাঝে এক একটা হালফেশানী মাল্টি স্টোরিড মান্নুষ-মৌচাক। ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা একটা শার্প

টার্ণ নিল। তারপর আরো নির্জন একটা রাস্তায় একটা পার্কের পাশের একটা গগনচুম্বী বাড়ির বেসমেন্ট্ কারপার্কে সিধে ঢুকে পড়ল।

গাড়ি বন্ধ করে সলিল বলল,

—চল্, এবার একেবারে সিধে টপ্ ফ্লোরে যাব।

লিফটে উঠে সামনের স্ট্রীপে ফ্লোরের আলোজ্বলা নম্বরগুলো দেখতে দেখতে, একবার ভাবলাম সলিলকে জিজ্ঞেস করি আমরা কোথায় যাচ্ছি? তারপর মনে হল আজ আর কোনো কিছু না জিজ্ঞেস করাই ভালো। বারো তলায় নেমে সলিল বাঁদিকের এ্যাপার্টমেন্টের বেল টিপল। আমাদের রিসিভ করবার জন্য দরজার ওপাশে ববি যেন তৈরী হয়েই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিল। ভিতরে ঢুকে চওড়া গ্রে রঙের পাপোশের ওপর দাঁড়িয়ে সলিল পরিচয় করিয়ে দিল,

—ববি, মিট্ সূর্য, আমার বন্ধু, আর সূর্য, এই হল ববি রায়। কি একটা বিলিতি এ্যাড্ভারটাইজিং ফার্মের নাম করে বলল ববি তার কি একটা অফিসার! তারপর ঘরের আমন্ত্রিতদের ভিড় থেকে মিমিকে টেনে এনে বলল,

—এই মিমি রায়, ববির বৌ। বোটিক্ চালায়, ওদের বাচ্চার এক বছর জন্মদিন হল আজ।

আমার তখনি কেমন যেন অস্বস্তি লাগল। মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি যাকে বলে আর কি।

কোনো উপহার আনি নি। কিছু না। সলিলের বন্ধুর বাচ্চার মুখ দেখব কি দিয়ে? কি একটা লজ্জার মধ্যে আমাকে ফেলে দিল সলিল।

আমি চাপা গলায় সলিলকে সে কথা জানাতেই সলিল বলল,

—আরে ছাড়! এটা সে ধরনের কোনো সামাজিক গ্যাদারিঙ্ নয়। কিংবা ফরমাল নেমন্তন্নর পার্টিও নয়। জাস্ট্ মিট্ করবার

একটা উপলক্ষ্য মাত্র। এসব কেসে ওরা ওসব উপহার টুপহার নিয়ে মাথা ঘামায় না।

ইতিমধ্যে ববি আর মিমি আমাকে ছুদিকে ছুহাতে ধরে টেনে নিয়ে গেছে।

প্যাসেজ পেরিয়ে একটা মস্ত হল ঘরের মতো বড় ঘর। একদিকে নরম রোমশ কার্পেট পাতা। হাল্কা শাদা রঙের। মনে হয় চমরির চামড়া কেউ সেলাই করে পেতে দিয়েছে। সোফা, পিয়ানো, পুফে, চেস্ট অফ্ ড্রয়ারস্, নানা রকম কিউরিও ভরা কাচের শো-কেস, সব ধারে ধারে সরানো। সম্ভবত ঘরটা ডাইনিং কাম্ ড্রইংরুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ডাইনিং চেয়ারগুলো দূরের দেয়ালে সার সার সাজানো। পাশের সাইডবোর্ডে কাচের পোর্সিলিনের দামী ডিনার সেট্ সব গাদা করে রাখা। ওপরের সিলিঙ্ থেকে একেলে স্ট্রীম্ লাইনড্ আলোর ঝাড় ঝুলছে। ফর্মাল ডাইনিং ড্রইং রুমের চেহারা মুছে গিয়ে সারা ঘরে এখন ঢালাও পরিবেশ। আমি বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখি, অচেনা পোশাক আর অচেনা চেহারার সব তরুণ তরুণী। এরা কি এই কলকাতা শহরেই থাকে? কোথায় থাকে এরা? আমি ত সারা কলকাতা চষে বেড়াই। এদের মতো কাউকে ত কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

ববি কেমন একটা নীটেড্ কাপড়ের জামা পরেছে, সিন্থেটিক। তার ওপর লুজ একটা সোয়েড্ লেদারের ফতুয়া। তলায় কাউবয় বেলবটম্। মাথার ঢেউ খেলানো উস্কো উস্কো চুলে আঙল চালিয়ে বার বার ঠেলে দিচ্ছে। মিমি একটা বেগুনী রঙের বুনোট্ করা নাইলনের শরীরে মেশানো স্যুট্ পরেছে। সরু বোলতার মতো কোমরে চওড়া শাদা বেল্ট্, নাভির কাছে একটু নামানো। সেখানে বড় সোনালী চক্‌চকে বকলশ্ লাগানো। পায়ে শাদা হিল্‌তোলা উঁচু শ্লিপার্। মিমির মাথার চুলও তার স্বামীর চেয়ে খুব একটা বেশি লম্বা নয়। ওদের ছুজনকেই এত বেপরোয়া আর বাচ্চা

বাচ্চা লাগছিল যে আমার ভাবতেই অসুবিধা হচ্ছিল যে ওরা বিবাহিত, এমন কি বাবা-মা, এবং একজন একটা অফিস চালায় একজন একটা বোটিক।

ঘরের আর সবাইও প্রায় তাই। আমার মতো, পুরোনো ধরনের চুলছাঁটা শার্ট প্যাণ্ট্ পরা ছোক্রা একজনও নেই। সলিলটাও লক্ষ্য করলাম দারুণ ফ্যাশানেবল্ স্যুট্ পরেছে। আমাদের কফি-হাউসের ছেলেরা অবশ্য এরকম পোশাক- আসাক দেখলেই বলবে, 'ফপিস্,' 'ড্যাণ্ডি'। আমি ঢুকে পর্যন্ত সলিলের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় খামের গায়ের ডাক টিকিটের মতো সেঁটে ছিলাম। সলিল কিন্তু আমাকে অন্য দিকে অন্যদের মধ্যে চলে যেতে বলছিল। আমি কার সঙ্গেই বা কথা বলব? কি কথাই বা বলব?

সলিলটা এমন পাজি, প্রথম চোটেই একটা অবাঙালী মেয়ের সঙ্গে চলে গেল। একেবারে ঘরের আর একটা আলো-আঁধারি প্রান্তে। আমি তখন একটা 'পুফে'তে বসে চুপচাপ কেবল দ্রষ্টার মতো চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। দেখলাম মিমিদের আবার লিভারি-পরা বেয়ারা আছে। তারা নিঃশব্দে ট্রেতে করে কাজু নাট্স আর হুইস্কি নিয়ে ঘুরছে। হুইস্কির সঙ্গে ছোট ছোট কাটগ্লাসের কেয়ারী করা পাত্র। পুফের ওপর হেলান টেলান না দিতে পেরে খুব একটা অস্বস্তিতে বসে দেখছিলাম তলায়, প্রায় আমার পায়ের কাছেই, কর্পেটের ওপর একটা নরম 'পিলোতে' কনুইএর ভর দিয়ে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে কথা বলছে। মেয়েটি হাঁটু মুড়ে গালে হাত দিয়ে এক মনে ছেলেটির কথা শুনছে। সামনে দুটি কাট্-গ্লাসের পাত্রও অমনি ঘনিষ্ঠ করে রাখা। ছেলেটির উরুতে মেয়েটির একটি হাত রাখা। দুজনকে এত চমৎকার মানানসই লাগছিল। আমি নিবিষ্ট হয়ে ওই দুটি মানুষকেই লক্ষ্য করতে লাগলাম। ছেলেটির চুলগুলি কোঁকড়া, বাদামী আভাধরা চুল। চোখদুটি একটু তেরছা আর ঘন পিঙ্গল। পরনে কালো সিল্কের কিংবা নাইলন সুতোর গেঞ্জী আর কালো এ্যালিফেন্টা লেগ প্যাণ্ট।

খুব তীক্ষ্ণ, ছাঁদে কাটা তেলতেলে ঈষৎ রোমহীন মুখ। মেয়েটির মাথার লম্বা চুল, মাঝের সরু শাদা সিঁথির তুপাশে পেতে আঁচড়ানো। লম্বা খাঁচের মুখ সেই চুলের ঝালরে অল্পই দেখা যায়। ভ্রূতুটি তুটি নিবিড় রেখার মতো করে প্রগাঢ় ভাবে টানা। চোখের পাতার ওপর দিয়ে কালো রেখা মোটা করে প্রায় কান পর্যন্ত টানা। ঠোঁটে শাদাটে রঙের লিপস্টিক। মেয়েটির পরনে ঢিলে ঢালা আলখাল্লা জাতীয় পোশাক। গলাটা গভীর করে কাটা বলে আমি তার তুটি স্তনই সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছিলাম। বলাই বাহুল্য মেয়েটি ভিতরে কোনো অন্তর্বাস পরে নি। ওরা ইংরিজিতে কথা বলছিল। অথচ পরে বুঝেছিলাম তুজনেই বাংলাদেশের মুসলিম তরুণ তরুণী। একজন উর্দুভাষী একজন হয়ত ইংরেজী ছাড়া আর কিছু জানে না।

—বলো, কি করবে তুমি শামিম? আজকের বাংলাদেশে ফিরে যাবে?

—ছেলেটি ভ্রূ কুঞ্চিত করে মেয়েটিকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলল,

—নাঃ।

আমি লক্ষ্য করলাম তার মুখে বিতু্যচ্চমকের মতো অদ্ভুত আনন্দ আর বেদনার তুটি ঝিলিক পর পর খেলে গেল। তারপর যেন নিজেকে ভোলাতে চাইছে, এমনি একটা তৃতীয় স্বরে বলল,

—তা ছাড়া এই কলকাতা শহরে বুঝলে রেহানা হাজারো মজা। কলকাতা আমাকে একেবারে পাগল করে দিয়েছে। বলো, কলকাতা কি রকম টানে না?

মেয়েটি কেমন অদ্ভুত করে তাকাল। যেন বহুদূর পর্যন্ত, দেওয়াল ভেদ করে তার দৃষ্টি চলে যাচ্ছে।

—আমার কিন্তু কলকাতা থাকার রেস্ত ফুরিয়ে এসেছে শামিম। এখানে মডেলিঙে তেমন পে করছে না এরা জানো। কাজও বেশি পাচ্ছি না। আমি বোধহয় নেক্সট্ উইকে বম্বে চলে যাচ্ছি।

—কবে যাচ্ছ ?

ছেলেটির কণ্ঠস্বর নিরাসক্ত। ঠাণ্ডা। নেহাতই জিজ্ঞেস করতে হয় বলে যেন ছেলেটি জিজ্ঞেস করেছ। এ ছাড়া ছেলেটির গলায় কোনো অতিরিক্ত উত্তাপ নেই। নিজের পানীয়ে চুমুক দিতে দিতে মেয়েটি বলল,

—যাওয়ার ভাড়া জোটাতে পারলেই চলে যাবো। তুমি ত জানো কলকাতার হোটেল চার্জ কি দারুণ। একটা বাজে হোটেলে আছি। জঘন্য রুম সারভিস্, টেলিফোনটাও অর্ধেক সময় কাজ করে না। পার ডে ফিফ্‌টি সিকস্ করে নিচ্ছে। আমার সব জুয়েলারী শেষ। এখন ড্রেসে হাত পড়েছে।

—ববি কি বলছে ? ও তোমায় কোনো কাজকর্ম দিতে পারছে না ?

—নাঃ।

রেহানা নামক মেয়েটি বসবার ভঙ্গিটা একটু পাল্টালো। তার চোখের ফিকে সবুজ তারা দুটো যেন দিশেহারা নৌকোর মতো একবার এদিকে একবার ওদিকে ভাসছিল।

ছেলেটি এবার উঠে বসল। বুঝলাম পকেটে হাত দিতে চায়। ও ভাবে ওরকম অদ্ভুত ভঙ্গিতে উঠে না বসলে আবার অত টাইট্ প্যাণ্টের পকেটে হাত দেওয়া যায় না। প্যাণ্টের পকেট থেকে কাগজপত্র, সোডার বোতল খোলার চাবি (এটা যে কেন পকেটে ?) ! গোছা গোছা পাকিস্তানী আর ভারতীয় কারেন্সীর সঙ্গে ছোট একটা রিভলভারও উঠে এলো। ওর মধ্যে থেকে বেছে বুছে ছেলেটি ভারতীয় কারেন্সীতে মেয়েটিকে প্রায় শ পাঁচেক টাকা দিল।

মেয়েটিও অম্লান বদনে পানীয়ে একটা সীপ্ দিয়ে টাকাটা ব্যাগে ভরে নিল। তারপর আবার আগের মতোই কথা বলতে লাগল ওরা। সিনেমা, মড্ ফ্যাশান রাজনীতি এই সব বিষয়ের কথা। কোনো পারিবারিক বা ব্যক্তিগত আলাপ না।

আশ্চর্য। ওদের একজনের হাত আর একজনের হাতে। ওদের একজনের উরু আর একজনের পাঁজরে সেঁটে আছে। কিন্তু চোখে

মুখে কিরকম একটু পুরু মোমের মতো নৈর্লিপ্তের প্রলেপ। যেন সুন্দর অথচ নিষ্প্রাণ, ভীষণ ভয়ঙ্কর ছুটো ম্যানিকুইন্।

আমি চোখ ফেরালাম।

চোখ ফেরালাম, এর চেয়ে কান ফেরালাম বললে বোধহয় আরো বেশি ঠিকঠাক্ বলা হয়।

কি যেন একটা মজার খেলা হচ্ছে আর একটা ছোট্ট দলের মধ্যে। পপসঙ্‌এর শেষের অক্ষর থেকে নতুন গানের লাইন টাইন বলা। গোল হয়ে, বসে দাঁড়িয়ে সোফার হাতলে, মাটিতে, পরস্পরের শরীরের উত্তাপ আর বিদ্যুতকে প্রবাহিত হতে দিতে দিতে আলোময় হয়ে ওরা খেলছিল। উরুতে চাপড়, পিঠে চাপড়, আর মাঝে মাঝে শুধু পানীয়তে চুমুক আর কাজু নাটস্ এর জন্য হাত বাড়ানো।

ওদেরই মধ্যে থেকে সে উঠে দাঁড়িয়েছিল। গানের শেষ লাইনের থেকে অন্য গান তৈরী করার খেলা ভেঙে দিয়ে একটা সম্পূর্ণ গান গেয়ে উঠেছিল।

আহা কি অদ্ভুত রূপার ঘন্টা বেজে উঠেছিল সারা ঘরের মধ্যে। সবাই যে যার কথাবার্তা, ঘনিষ্ঠতা ব্যক্তিগত আদর আবেশ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে অলকাকে দেখছিল।

অলকা যেন ক্রমশ শাদা ফুলের মতো, শাদা অনৈসর্গিক একমুঠো কুয়াশার মতো, আশ্চর্য নাইলনের ফানুসের মতো উঠে যাচ্ছিল। বড় হয়ে উঠছিল।

অলকার পরনে ছিল শাদা দুধের রঙের স্ল্যাক্স, আর কলিদার চিকনের লক্ষ্ণৌ পাঞ্জাবী। তার গলার ব্রঞ্জের চেন থেকে দুলছিল ব্রঞ্জের একটা অতিকায় পেনডেণ্টে এক নৃত্যরত নটরাজ মূর্তি। হাতে ছিল তার সিরামিকের কাজ করা শাদা ধবধবে একটি বিয়ারের 'মগ্'।

ছোটবেলা কোথাও সমুদ্র থেকে উঠে আসা মৎস্য কন্যার ছবি দেখে থাকব হয়ত। অলকা যেন সেই স্মৃতিকেই ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনছিল।

আমি হাতে আশ্চর্য সুন্দর কাট্ গ্লাসের একটি পানপাত্র নিয়ে, ঠিক হিন্দি সিনেমায় যেমনটি দেখা যায় তেমনি পরিবেশে, যদিও রঙীন পানীয়, তবু কেমন যেন জ্বালা জ্বালা, তার্পিন তেল, তার্পিন তেল গন্ধ ওঠা ব্যাপারটায় চুমুক মারছিলাম। আর কটু কষায় স্বাদ শুদ্ধির জন্য লোনা কাজু বাদাম মুঠো মুঠো করে চিবোচ্ছিলাম। লক্ষ্য করলাম, পার্টির হাল্‌কা পরিবেশটা কেমন যেন উদাস আর নির্বাক হয়ে যাচ্ছে।

এমন কি আমার কাছ থেকে অনেকখানি দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সলিলকেও দেখলাম, তার পাশের মিনি স্কার্ট পরা মেয়েটির চামরের মতো চুলের গোছা গালে ঘষতে ঘষতে কেমন যেন আস্তে আস্তে থেমে গেল। স্থাণু হয়ে গেল। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল অলকার দিকে।

হঠাৎ মিমিই বোধহয়, হ্যাঁ প্রথমেই মিমি, সব যাদু ভঙ্গ করে দিয়ে বন মোরগের মতো ছট্‌ফট্ করে উঠে বলল,

—বাট্ ডোণ্ট সিং এগেন লোকা, দ্য লাইফ্ অফ্ দ্য পার্টি ইস্ ডাইঙ্।

বিয়ার মগ হাতে নিয়ে, মিমি তার জুতোর মধ্যে দিয়ে মাটি না ছুঁয়ে যেন হাওয়ায় উড়ে উড়ে হেঁটে গিয়ে ববির কানে কানে কি বলল। সঙ্গে সঙ্গে ববি রেকর্ড প্লেয়ার চালু করে দিয়ে, সবাইকে দু হাত তুলে ডাক দিল,

—লেট্‌স ডান্স! ডান্স!

ব্যাস্ অমনি উঠে পড়ল সবাই। দল ভাঙল, জুটি বদলাল। শুরু হল উদ্দাম নৃত্য।

এই নাচের মাঝখানেই টেবিলের উপর থেকে বেয়ারারা বোতল, গ্লাস, নাট্‌স, চিপ্‌স সব পাশে সরিয়ে দিয়ে তন্দুরি চিকেন আর নান রুটির বারকোশ রেখে চলে গেল। আর নতুন সুরা মানে স্পিরিট নয়। ওয়াইন।

আমি দেখতে লাগলাম শরীর কি ভাবে নানা ঢঙের ঢেউ হয়ে যেতে পারে। আমি এই প্রথম জানলাম মুখ বুক নিতম্ব এই সব বিধিবদ্ধ

যৌন উত্তেজক শরীর সংস্থান ছাড়াও কটি, উরু, অনাবৃত বাহু, ঘাড়, কাঁধ কতখানি পিপাসা জাগাতে পারে।

তাই যথেচ্ছ নাচ গান হতে হতে যখন সমস্ত ঘটনাটা প্রায় সমে পৌঁছে গেল তখনই বেয়ারারা মিমির ঈশারায় ডিশপ্লেট সরিয়ে নিয়ে গেল। টুপ্ টাপ্ অন্ধকারে খসে পড়তে থাকল শাদা শাদা আলো-গুলো। একটি দুটি নীল, সবুজ, লাল জিরো পাওয়ারের আলোর বাল্ব জ্বলে থাকল। এবং সেই অদ্ভুত উদ্ভাসিত রঙীন অন্ধকারে আমি দেখলাম ঘরের মাঝখানে অল্প একটু পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে মিমি তার ঘোর বেগুনী রঙের নীটেড্ ড্রেস পরা কোমর থেকে সোনালী বকলশ লাগানো শাদা বেল্টটা আস্তে আস্তে খুলে ফেলছে।

আমার হাত পা ভীষণ ভয়ে থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল। মিমি আর ববির এই আকাশছোঁয়া এ্যাপার্টমেণ্টে আসার পর থেকেই আমি ক্রমাগত নতুন নতুন আর অভাবনীয় ঘটনা ঘটতে পারে দেখছিলাম। কিন্তু আমি ত আর দুধের বাছা নই। উনিশ বছরের যুবক। এখন যা ঘটতে চলেছে, আমি বুঝতে পারলাম, এতটা সহ্য করবার ক্ষমতা আমার আদৌ নেই। আমার সমস্ত শরীর যখন মর্মে মর্মে, কোষে কোষে থরথরিয়ে উঠছে তখন শেষ কটা আলোও টুপ্ টাপ্ ঝরে পড়ে সারা ঘরে থরথরে অন্ধকার ঢেউ খেলতে লাগল।

সেই ঢেউ খেলানো অন্ধকারে আমি এবার সামিল হলাম অদ্ভুত সব শব্দের সামনে। উচ্চকিত হয়ে উঠল শব্দ থেকে আরো ঘোরতর শব্দ শৃঙ্খল। পোশাকের খস্‌খস্, হাসির টুক্‌রো টাক্‌রা, খুনসুটি, সঘন নিঃশ্বাস। আমি চতুর্দিকের ক্রমশ উঠে দাঁড়ানো ছেয়ে যাওয়া শব্দের জাঙাল ভেদ করে কিছুতেই আর যেন বেরিয়ে পড়তে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল যেন এক অদ্ভুত যাদুময় অরণ্যে আমি হারিয়ে, তলিয়ে যাচ্ছি।

আমার বসার আসনটি ছেড়ে, পানপাত্রখানি হাত থেকে নামিয়ে রেখে জলেডোবা মানুষের মতো দমবন্ধ আবহাওয়া থেকে কোনোক্রমে

ছুটে বেরিয়ে, অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে, হাঁফ ছাড়বার জন্য কুটো খুঁজতে খুঁজতে, ঠেলা খেতে খেতে, ঠেলা দিতে দিতে, পোশাক পরা, পোশাক খোলা মাংসের সমুদ্রের মধ্য দিয়ে সাঁতরাতে সাঁতরাতে হঠাৎ যেন দেখলাম দূরে একটি আবছা, আলোকিত আয়তক্ষেত্র। যেন এক দীর্ঘ অন্ধকার ঘরের গুহামুখ। শেষপর্যন্ত ঠাহর হল এই বিরাট ঘরটিরও একটি খোলামুখ আছে। একটি দরজা। সেই দরজা দিয়ে একটি ব্যাল্‌কনিতে হয়ত পৌঁছোন যায়। আমি ঘরের ভিড় ভেঙে কোনোমতে সেখানে পৌঁছে, বুক ভরে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম।

আমার পিছনে ঘরের মধ্যে অন্ধকার তখন ভীষণ শব্দ করে উঠছে। তোলপাড় করছে। সেই অন্ধকার আর শব্দকে প্রাগৈতিহাসিক সময়ের মতো পিছনে ফেলে দাঁড়িয়ে আমি ব্যাল্‌কনির রেলিঙে দুহাত রেখে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললাম।

আমার সেই কান্নার পাতলা জলের পর্দার ওপাশে সেই বারোতলা থেকে দেখতে পাওয়া মুঠো মুঠো তারা ছেটানো কলকাতা আমার সেই দুঃখকে একফোঁটাও ফিরিয়ে দিল না।

কান্না একসময় শুখিয়ে এল। আমি দু চোখ বিস্ফারিত করে দেখতে লাগলাম। এর আগে কখনো রাত্রিবেলা, এত উঁচু থেকে আমি এভাবে কলকাতা শহরকে দেখি নি। এতখানি ছড়ানো পঁচাত্তর মিলিমিটারের প্যানারোমা আকাশ। মিড্ নাইট্-ব্লু স্কাই। সেই আকাশে বিঁধে থাকা শহরের উদ্ধত স্কাইস্ক্রেপার আর পিঁপড়ের বাসার মতো গুঁড়ো গুঁড়ো বাড়ি। লাল রক্তবিন্দু, আর নীল সবুজ মণিচূর্ণের মতো আলো। দূরে পার্ক স্ট্রীট আর চৌরঙ্গিতে খাটানো বড় বড় বিজ্ঞাপনের নিয়নে গড়া মিনিয়েচার শরীর। কলকাতা। মেট্রোপোলিস্।

মনে পড়েছিল আমার বাবাকে একবার মেট্রোপোলিস্ কথাটার অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলাম। বাবা আমাকে শব্দটার অভিধানগত অর্থটা

বলেওছিলেন। কিন্তু সেদিন আমি মাথার মধ্যে সেই বিরাটত্বকে ধরতে পারি নি। আজ পারলাম। মহানগর একটা কি বিপুল কথা। একটা কতবড় মাপের চেতনা। একটা কি ভীষণ তীব্র বোধ। আমার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠেছিল। আর ঠিক তখনই আমার পাশে দুলতে দুলতে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই মেয়েটি। কয়েক বছর বাদে যার নাম আমি জেনেছিলাম, অলকা।

কাঁদো কাঁদো স্বরে, জড়ানো জড়ানো উচ্চারণে অলকা বলেছিল,

—ডু ইয়ু নো আই হ্যাভ্ লস্ট্ মাই নটরাজ?

আমি রূপোর ঘণ্টার মতো সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর শুনছিলাম। নিজের দুধের রঙের কামিজে মোড়া বুকে একটি হাত রেখে কথা বলছিল অলকা। তার আঙুলে জড়ানো ছিল শুধু ব্রঞ্জের চেন্‌টা। সত্যি তাতে সেই ভারী নটরাজের লকেটটা দুলছিল না। অলকার চোখ ছলছল করে উঠলো। তারার আব্‌ছা আলোয় আমি দেখলাম। অলকা মাথা নেড়ে নেড়ে বলেছিল,

—ইট্‌স এ ব্যাড্ ওমেন, ইট্‌স এ ব্যাড্ ওমেন্! অমঙ্গল হবে অমঙ্গল!

অলকা তারপর অনেকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুপচাপ কি যেন ভাবছিল। অনেক দূরে অন্য কোথাও নিজেকে নিয়ে বেড়িয়ে এলো যেন। তারপর হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে আমার দিকে ফিরে বলেছিল,

—এই প্রথম বুঝি?

আমি মাথা নেড়ে বলেছিলাম,

—হ্যাঁ।

অলকা প্রায় ডুক্‌রে উঠে বলেছিল,

—বিশ্বাস কর, আমারও, আজ— নাঃ এরকম পরিবেশে যদিও এই প্রথম নয়। কিন্তু এভাবে একা একা··· !

অলকা ভেঙে পড়েছিল।

—বিশ্বাস করো আমি আসতে চাই নি। আমাকে জোর করে পাঠানো হয়েছে!

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। অলকার মাথাটা অসহায় ভাবে যেন বুকের ওপর ঝুলছে। কেমন যেন মনে হল হাড়-কাঠে লাগানো।

বলেছিলাম,

—আ—আপনি এলেন কেন?

অলকা বলেছিল,

—আমি ত আসি নি। ব্যবসার সুবিধের জন্য আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে।

আমি বলেছিলাম,

—কার ব্যবসা?

অলকা বলেছিল,

—ব্যবসাদারের! যাকগে ওসব কথা, আপনি দেখছি বড্ড নভিস্, বলি বয়স কত?

—উনিশ।

—আমারও উনিশ। উঃ সুকান্ত ভট্টাচার্যের সেই কবিতাটার শব্দ বদলে বলতে ইচ্ছে করছে 'উনিশ বছর বয়স কি দুঃসহ?' ইচ্ছে করছে না তোমার?

আমি অবাক হয়ে অলকার ধাপে ধাপে এগিয়ে এসে 'তুমি'তে পৌঁছে যাওয়ার সাহস দেখছিলাম।

—চলো, চলে যাই। তোমার এখানে ভালো লাগছে না, আমারও লাগছে না। চলো পালাই।

অলকা আর এক ধাপ এগিয়ে এসে আমার হাত ধরেছিল।

আমি আমতা আমতা করে বলেছিলাম,

—কিন্তু, আমি যে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে এসেছি!

—দূর! বন্ধু টন্ধু কিছু মনে করবে না। এসব পার্টিতে ওসব কোনো

নিয়ম কানুন নেই। যার সঙ্গে খুশি এসো, যতক্ষণ খুশি থাক, যার সঙ্গে খুশি, যখন খুশি বেরিয়ে যাও···বুঝলে!

—এই শোনো!

অলকা আমার হাত ধরে টেনেছিল। সে অল্প অল্প টলছিল। আমার হাত ধরে সেই স্পন্দিত মাংসের তরঙ্গের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে চাপা গলায় বলেছিল,

—যাবে? আমার ফ্ল্যাটে যাবে। আজ-থেকে আমার নতুন ফ্ল্যাট। ওয়েল ফার্নিশড্। আর আমায় ঠেঙিয়ে আমাদের সেই ট্যাংরার বাড়িতে আমার 'ফ্যামিলির' কাছে ফিরে যেতে হবে না। আমার ডানলোপিলোর গদী দেওয়া বিছানা। শুলেই অগাধ স্বপ্ন, অগাধ ঘুম। যদি শুরু করতেই হয়, পঞ্চাশ বছর দিয়ে কেন? উনিশ বছর দিয়েই শুরু হোক্ না।

আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম,

—কি বলছ উল্টোপাল্টা?

অলকা যেন নিজেকেই শুনিয়ে বলছিল,

—আই হ্যাভ্ লস্ট্ মাই নট্‌রাজ্, এ্যাণ্ড্ দ্যাট্স এ ব্যাড্ ওমেন্ ···আজ আমার জীবনে একটা অদ্ভুত কিছু ঘটবে। ঘটবেই। আমি চাই তুমিই ঘটিয়ে দাও, ঘটিয়ে দাও, কিন্তু তুমি, তুমি এত নিষ্পাপ!

অলকার হাত ধরে কিচেন আর প্যান-ট্রির মধ্যে দিয়ে গিয়ে একটা খিড়কি দোর দিয়ে বেরিয়ে আমরা লম্বা করিডোরে পড়লাম। অটো-মেটিক্ লিফ্‌টে ঘেঁষাঘেঁষি পাশাপাশি নামতে নামতে জানিনে মদের ঝোঁকে কিনা, কিংবা মদ নেহাতই একটা অজুহাত, আমার কিন্তু অনেক নিষিদ্ধ ইচ্ছে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমি যেন এক অনন্ত যৌবনা 'প্রসারপিনা'র সঙ্গে অতলে নেমে যাচ্ছি। কিন্তু লিফ্‌ট পৃথিবীর মাটি ছুঁতেই আমার সাড় এল। অলকার পাশে পাশে হেঁটে কার্ লটের কাছে এলাম। দেখলাম সলিল আমার আগেই কেটে গেছে। ওর সোনালী স্ট্যাণ্ডার্ডহেরাল্ড্‌টা নেই।

অলকাকে দেখেই বোধহয় একটা বড় গাড়ি বেরিয়ে অলকার ঠিক সামনে ড্রাইভে দাঁড়াল। দরজা খুলে দিতেই অলকা বলল,

—এসো, আসবে না ?

আমি মাথা নাড়লাম। আসলে ওর মড্ পোশাক, ওর বিলেতী গাড়ি, ওর অসাধারণ গানের গলা, শুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ—এই সব মিলিয়ে আমার কি যে দারুণ হিংসে হচ্ছিল !

অলকা ঘাড় ফিরিয়ে বলল,

—এসো না, আই উইল সিম্প্লি ড্রপ্ ইয়ু…

আমার সমস্ত শরীরে ঝাঁকি দিয়ে উঠল একটা তীব্র ক্রোধ। আমি হঠাৎ টিপিক্যাল ঘটি ডায়ালগে বলে উঠলাম,

—আপনার বড় বিলিতি গাড়ি অদ্দূরে যেতে পারবে কি ? আমি আবার থাকি শ্যামবাজারে শশী সরকার লেনে! আমার কিন্তু বাসে চলে গেলেই সুবিধে। এই বলে অলকাকে অবাক করে দিয়ে, দু' পকেটে হাত ঢুকিয়ে মাস্তানের মতো, আমি সোজা হেঁটে গেলাম সেই বিশাল স্কাইস্ক্রেপারের গেটের দিকে। তারপর বাসে উঠেছি, বৌবাজার পেরিয়েছি, হাতিবাগান পেরিয়েছি। নিজের স্টপে নেমেছি, গলিতে ঢুকেছি, তার ওপরে, হঠাৎ ইলেক্ট্রিকের একটা ন্যাড়া বাল্ব্ ঝোলানো আলোকিত ঘরের ভিতরে, দড়িতে সার সার বাচ্চার কাঁথা ঝুলতে দেখে আমার আচম্কা মনে পড়ল, আরে ববি আর মিমির বাচ্চা দেখা হল না ত ?

তারপর মনে হতে লাগল, আচ্ছা আজ সন্ধ্যেবেলা কফি-হাউসে যাবার পর থেকে ব্যাপারগুলো ঠিক্ঠাক্ পরপর সত্যি সত্যি ঘটেছিল ত ?

সত্যিই কি কলকাতা শহরে ববি-মিমিদের ঐ বারো তলার ওপরের এ্যাপার্টমেন্টটা আছে ? পৃথিবী থেকে অনেক ওপরে, শশী সরকার লেন থেকে অনেক দূরে উঁচুতে, নাগালের বাইরে একটা অদ্ভুত জায়গায় ? সত্যিই কি সলিল নন্দী এসেছিল কফিহাউসে ? সত্যিই কি

আমি প্রথম মদের আস্বাদ পেলাম ? আমি কি সত্যিকার রিভলভার দেখলাম কাছ থেকে ?

আর রূপোর ঘণ্টার মতো গানের গলা যার, সে মেয়েটির দুই স্তনের মাঝখানে দুলতে থাকা সেই অতিকায় নটরাজের লকেট্‌টা আমার স্মৃতির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

পঁচাত্তর মিলিমিটারের স্ক্রীনে দেখা মেট্রোপোলিস্‌ কলকাতা ঘুরতে লাগলো আমার মাথার ভেতর, এবং আমার পা হোঁচট খেলো কলকাতা কর্পোরেশন এর বিশ্রী ভাবে খোঁড়া আমাদের শশী সরকারের গলিতে। আমার দু পাশে গলির নিজস্ব গন্ধ। মাথার ওপর খাঁজ কাটা কাটা, ওই গলিরই উল্টো প্রতিচ্ছবির মতো একটা ঘোলাটে আকাশ।

আমি আস্তে আস্তে আমাদের অনেক ফ্ল্যাটের বাড়িটায় ঢুকলাম। নীচ থেকে ওপরে তাকিয়ে চোখে পড়ল রুমাদের ফ্ল্যাটটা অন্ধকারে ডুবে আছে। মাসিমা কি ঘুমিয়ে পড়েছেন ? না খালি ফ্ল্যাট বাড়িটায় ভূতের মতো একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন কে জানে ?

মাসিমা আর স্টেশন পর্যন্ত যান নি। রুমা আর রুমার বাবাও তেমন কিছু জোরজার করেন নি। শুনছিলাম রুমার বাবা স্টেশনে ওঁর অফিসের লোকদের মাসিমার শরীর ও চাকরি সংক্রান্ত কি সব অজুহাত বানিয়ে বলছিলেন।

আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠে দুটো ফ্ল্যাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভাবলাম একবার মাসিমার কাছে যাই। কিন্তু মাসিমা যদি আমার মুখে গন্ধ পান। আমি যদি মাসিমাকে কোনো বেফাঁস কথা বলে ফেলি! মাসিমার ফ্ল্যাটের উল্টোদিকে আমাদের ফ্ল্যাট। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের ফ্ল্যাটের অনেক তুচ্ছ সামান্য দৃশ্য আমার মনে এল। আমাদের ঘর। ঘরে ঘরজোড়া বড় তক্তপোষ। তাতে আমাদের ক'ভাইএর ঢালা বিছানা। দিনের বেলা বিছানা গুটোনো, শতরঞ্চি ঢাকা। দেয়ালে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি দেওয়া ক্যালেণ্ডার, মায়ের ঠাকুরের আসন পাতা। বোনেদের পুতুলের টিনের বাক্স, বই-এর

্যাক। আমি আস্তে আস্তে একবার মাসিমার দরজায় গিয়ে কলিং বেলে অভ্যস্ত হাত রেখেই সরিয়ে নিলাম। জাপান থেকে আনা কলিং বেল্। ঘণ্টা ধ্বনির মতো ক্রমাগত ছন্দোময় শব্দ তুলত ভিতরে। অনেক আগেই ক্রেতারা মুচ্‌ড়ে খুলে নিয়ে গেছে। মাসিমার বন্ধ নিঃশব্দ দরজার ঠাণ্ডা কাঠে গাল ঠেকিয়ে আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

অলকার সঙ্গে আমার দ্বিতীয় দেখাও বড় অদ্ভুত ভাবে হয়।

অদ্ভুত জায়গায়। অদ্ভুত দিনে। অদ্ভুত পরিবেশে।

সেদিনটির কথা বলার আগে একটা মোটামুটি সময়ের হিসেব দেওয়া প্রয়োজন।

বছর দুই কেটে গেছে ইতিমধ্যে। আমি এম. এ. দেব। বয়স একুশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ডিপার্টমেণ্টের ছাত্র হিসেবে গর্ব বোধ করি। আমি আর সেই মেনীমুখো উনিশ বছুরে সূর্যটি নেই। গোটা দুই টিউশনি করি। একটা অনিয়মিত লিট্‌ল ম্যাগাজিন বের করি। আর ভয়ঙ্কর সাবালক হয়েছি। আমি এখন কফি-হাউস কাঁকানো সূর্য রায়। কথায় কথায় সিগারেট ধরাই, বেশ খোলা-মেলা ভাবে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অশ্লীল কথা বলতে পারি, মেয়েদের সঙ্গে একটু আধটু গোধূলী গোধূলী ভাবও আমার বেশ আসে।

অথচ, সন্ধ্যেবেলা একা থাকলে আমার গলা চেপে আসে, রাতে ঘুম ভাঙলে ঘাড় বাঁকিয়ে আকাশ দেখার চেষ্টা করি, বাড়ি ফেরার পথে কুয়াশা ভরা সন্ধ্যেবেলা শর্টকাট্‌ গলিতে শিউলির গন্ধ পেলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়।

আমার বড়দা ইতিমধ্যেই বিয়ে থাওয়া করে বৌ নিয়ে আলাদা হয়েছে। মা এজন্য খুব কষ্ট টষ্ট করলেও আমি আর মেজদা গোপনে ব্যাপারটাকে সাপোর্ট করি। কারণ বড়দা বৌ নিয়ে এই ফ্ল্যাটে

থাকলে তো আমার আর মেজদার ব্যবস্থা হত মাঝের প্যাসেজে
আমার দুটি বোনের মধ্যে দিদি মানে মেজদার ছোট আমার বড়
রেজেস্ট্রী করে বিয়ে করেছে। ও এখন পাটনায়। ফলে আর এক
বোন, মানে আমার ছোট, পিঙ্কুকে বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

সুতরাং বাড়িতে এখন শুধু বাবা, মা আর আমি, মেজদা। এ
বাড়িতেও আমি মাঝে মাঝে শখ সৌখীনতা করার প্রচেষ্টা করি। এতে
অবশ্য নোঙরাই বাড়ে বেশি। জঞ্জাল জড়ো হয় বিনা কারণে। হঠাৎ
হঠাৎ এক একদিন হয়ত একগুচ্ছ রজনীগন্ধা এনে ফেলি। তারপর
ফুল ঝরে যায়, ডাঁটা হল্‌দে হয়ে যায়, ডগায় পচ্‌ ধরে, তবু ফেলি না।
পত্র-পত্রিকা জড়ো করি। মেলা থেকে ঘর সাজানোর সৌখীন ছোট
খাটো জিনিস কিনে আনি। তারপর তা ভাঙে, ফাটে, যথারীতি ঝুল
পড়ে, রঙ জ্বলে যায়। এবং বাঙালী বাড়ির রীতি অনুযায়ী জড়ো হতে
থাকে, ফেলা হয় না।

রুমার খবর আজকাল আর তেমন নেই। বছর খানেক সব চুপ
চাপ। ইতমধ্যে রুমা মাসিমাকে গোটা দুই চিঠি লিখেছিল। দুটোতেই
সে মাসিমার কাছ থেকে টাকা চায়। মাসিমা রুমাদের পুরোনো ফ্ল্যাট
ছেড়ে দিয়ে তাঁর স্কুলের কাছাকাছি একটা বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে
ছিলেন। নতুন ভাড়াটেরা রুমার চিঠি এলে আমাকেই পৌঁছে দিত
আমি চিঠি দিয়ে আসতাম মাসিমাকে।

দ্বিতীয় চিঠি লেখার কিছুদিন পরে রুমা কদিনের জন্য কলকাতায়
আসে। তার মায়ের কিছু দামী শাড়ি আর গহনা নিয়ে যেতে। সে
সময়ে তার কাছে কমল খান্নার গল্প শুনতে হত আমাকে। উড়োপিপি
মিলি দত্তের গল্পও।

মিলি দত্ত আর তার বাবা ডিভোর্স পেলেই বিয়ে করছে। সে
হোস্টেলে থাকে। ছুটিতে মিলি দত্ত কিংবা বাবার ফ্ল্যাটে থাকে
মিলি দত্তর ওখানেই কমল খান্নার সঙ্গে আলাপ। দারুণ ব্রাইট ছেলে
ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে ফাইন্যাল ইয়ারে। নিজেদের স্কুটার সারানো

ড় দোকান আছে। দারুণ মোটর বাইক চালায়। ঝড়ের বেগে। মাঝে মাঝে কমলের সঙ্গে রুমা বেরিয়ে পড়ে লঙ্‌ ড্রাইভে। বেশ কাটে। রুমা অবশ্য এখনি বিয়ে করছে না। বি. এ.টা অন্ততঃ সে পাশ করতে চায়। নীতিশ সাহা 'ফরেনে' গেলে তারও ইচ্ছে একবার ঘুরে টুরে আসে।

এতসব ঘটনার পর আর কি পুরোনো বাসি প্রেমের কথা টিকতে পারে!

এ ত একবছর আগের খবর। তারপর বছরখানেক রুমা বা নীতিশ-বাবুর কাছ থেকে ডিভোর্সের তদ্বির তদারক ছাড়া আর বিশেষ কোনো সাড়াশব্দ ছিল না। আর মাসিমা—

মাসিমার কথা বলতে গেলে এত বলতে হয় যে অলকার কথা অনেক পিছিয়ে যেতে পারে। আমি তা চাই না। তাই আপাতত অলকার কথাই হোক।

পরের বছর পুজো এলো।

পাড়ার ফাংশনে পুজোর সময় মাইক্রোফোন হাতে পেয়ে যখন নানারকম বখামো করছিলাম তখন আমার জীবনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে গেল।

রাত প্রায় বারোটা। মহাষ্টমীর দিন। আমাদের পাড়ায় সেবার পুজোর সিল্‌ভার জুবিলির ধুমধাম। দারুণ আলোক সম্পাতের খুব জোর ব্যবস্থা হয়েছিল সেবার। প্রতিমা হয়েছিল আদিম গুহা মানবের আঁকা দেয়ালচিত্রের কায়দায়। চাকরি ইত্যাদির মতো পাড়ার এক খবরের কাগজের অফিসের এ্যাসিসট্যাণ্ট্‌ এডিটরকে বিস্তর তদ্বির তদারক প্রতিমার একটা ছবি ছাপানোরও ব্যবস্থা করা হয়। এত সব পাবলিসিটির পর যেমন হয়, তেমন, প্রচণ্ড ভিড়। লোক পায়ে পায়ে হাঁটছিল। স্পেশাল পুলিশ দিয়েও ভিড় কণ্ট্রোল করা শক্ত হয়েউঠছিল। প্রচুর হাতছাড়া, দল ছাড়ার নাম মাইক্রোফোনে এ্যানাউন্স করতে হচ্ছিল। সেই সঙ্গে মাইক্রোফোন মারফৎ জলসা।

গায়ক গায়িকাদের বসানোর জন্য টঙের মতো উঁচু মঞ্চ করা হয়েছিল যাতে সবাই দেখতে পায়। এক্সিবিশনিজম্ এর একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়।

হাতের নাগালে মাইক্রোফোন পেয়ে সেদিন আমি সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে বাজী রেখে রেডিও, রেকর্ড, সিনেমা জগতের সব কমেডিয়ান আবৃত্তিকার আর নায়কদের নকল করে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দলের বাদল এসে বলল,

—সুধাদা তোমাকে বিলুকাকা ডাকছে।

বিলুকাকা মানে আমার বাবা। পাড়ার পুজো কমিটির ওলডেস্ট মেম্বার। আমার ভয় হল। বাবা হয়ত আমাকে বকাঝকা করবার জন্য ডাকছেন। সত্যি বখামোর মাত্রা ত অনেকক্ষণই ছাড়িয়েছি।

কাঁপতে কাঁপতে ভলান্টিয়ারদের ক্যাম্পে এলাম। ভিতরে বাবা আর বাবার দু'চারজন বন্ধু বসেছিলেন। বাবার সামনে একজন অচেনা ভদ্রলোক বসে। ভদ্রলোকের পরনে দামী স্যুট্।

বাবা তাঁকে দেখিয়ে বললেন,

—ইনি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছেন।

আমি অবাক হয়ে কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসলাম।

ভদ্রলোকের বয়স প্রায় আমার বাবার মতো। চালচলন প্রায় কুমার বাবার মতো। আবার মুখে পুরু পাউডারের প্রলেপ। কোটে সেন্টের তীব্র গন্ধ। অথচ যখন একটু সরে এসে আমার মুখের কাছে মুখ এনে কথা বলছিলেন তখন বুঝেছিলাম কিঞ্চিৎ টেনেছেন।

—আপনি এতক্ষণ মাইকে এনাউন্স করছিলেন?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

—ভারী চমৎকার ভয়েস আপনার। অলকা বলছিল,

আমি স্মিত হেসে তাকালাম লোকটির দিকে।

—আমার নাম সুধীন। সুধীন চৌধুরী। ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলাম। আপনার ভয়েস শুনে আলাপ করতে ইচ্ছে হল। অলকাও খুব ইন্টারেস্টেড্।

—কে অলকা ?

ভদ্রলোক হেসে বললেন,

—রেডিওর কমার্শিয়াল সারভিস্ শোনেন ?

—কমার্শিয়াল সার্ভিস ?

—ওই হল আর কি। চল্‌তি কথায় বিবিধ-ভারতী। বিবিধ-ভারতীর বেশির ভাগ জিঙ্গলে ফিমেল ভয়েস যার সেই জনপ্রিয়া জারিনাই অলকা!

আমি চমকে উঠলাম। জারিনার কণ্ঠ আমার বড় প্রিয় কণ্ঠ। একটু ভারী অথচ মনে হয় চকচকে স্টীলের ওপর রূপোলী পারার বিন্দু গড়িয়ে পড়ছে, এমনি, অদ্ভুত স্নায়ুতে শিহরণ লাগানো কণ্ঠস্বর। এই কণ্ঠ আমি যেখানে যখনই শুনি চিনতে পারি। ভাবা যায় সেই কিন্নরকণ্ঠী জারিনা আমার কণ্ঠস্বর শুনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন ?

জারিনার কণ্ঠস্বর শুনে তার চেহারার যে ছবি আমি আঁকতাম তা অনেকটা গ্রামোফোন রেকর্ডের কভারে ছাপানো বেগম আখতারের অল্প বয়সের ছবির চেহারার মতো।

ভদ্রলোক একটা কেতাদুরস্ত ছাপানো কার্ড বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন,

—আসুন না আমাদের অফিসে। দেখা যাক আপনার ভয়েস কেমন আসে। এক আধটা জিঙ্গল করতেও পারেন। ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন। আমি কার্ড হাতে করে বেশ খানিকক্ষণ হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আর প্যাণ্ডেলে ফিরে গেলাম না। আস্তে আস্তে বাড়ি চলে গেলাম। বাড়ি ফিরে দরজা জানালা বন্ধ করে, এ্যাম্‌প্লিফায়ারে গান, পুজোর দর্শনার্থীর কোলাহল এড়িয়ে আমার ঘরে বিছানায় শুয়ে, বুকের কাছে ব্যাটারি ডাউন ট্রানজিস্টারটাকে ধরে, চাবি ঘুরিয়ে বিবিধ-ভারতী খুলে দিলাম। আমার কানের কাছে বাজতে লাগল হিন্দি গান। তারপর গান থেমে গেল। বাজলো ছোট্ট

ঘণ্টা ধ্বনি। অকস্মাৎ সেই জ্যোৎস্নার শব্দ, রূপালী ঘণ্টা ধ্বনি, সেই কিন্নর আওয়াজ,

টার্কিশ বাথ্
তুর্কি হারেমের স্নানের আরাম
এনে দেবে আপনার স্নান ঘরে!
আপনি যদি পুরুষ হন, নিজেকে মনে হবে স্বয়ং সুলতান
যদি রমণী হন মনে হবে রাণী! সুলতানা!
যেমন মন মাতানো গন্ধ পাবেন নিজে
তেমনই শরীর মাতানো গন্ধ পাবেন আপনার আপনজন
আশ্চর্য স্নান-সাবান টার্কিশ বাথ্
আপনার রোমকূপ থেকে সরিয়ে নেয় বাড়্তি ময়লা
সারাদিন আপনাকে রাখে সতেজ! স্নিগ্ধ।

আবার ঘণ্টাধ্বনি। এবং সব শেষ।

জারিনা, জারিনা, এখন তার আসল নামও আমার জানা। অলকা। কিন্তু অলকার বয়স কত? কে জানে? দেখতে কেমন? নিশ্চয়ই ওই লোক্টা, ওই সুধীন চৌধুরী না কি? তার বয়সী। দেখতে কেমন? ওর কণ্ঠস্বরের মতো? না কালো মোটা। যেমন আমাদের ওই কি যেন কি গায়িকা! শর্মিষ্ঠা দাশের মতো। দেখতে হাতীর মতো অথচ ভেতর থেকে বেরোয় পিন্‌পিনে বাঁশির মতো আওয়াজ।

পরদিন বাকি সব কৌতূহলেরই নিরসন হল।

জায়গাটা চৌরঙ্গি অঞ্চলে। বাইরে এনামেল প্লেটিংএর ওপর লেখা 'শব্দ ভারতী'। পাশেই গেটে দারোয়ান বসে আছে। অনেক অফিস। একদিকে তীর চিহ্ন দিয়ে ফ্লুরেসেণ্ট্ রঙে লেখা, 'শব্দ-ভারতী'। আমি এগিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ালাম। ভিতরে ফিকে মভ্ রঙের ডিসটেম্পার করা, ঝকঝকে স্টিলের ফার্নিচারে সাজানো অফিস। এবং সবচেয়ে বড় টেবিলের সামনে বসে ছিল অলকা। অলকাই আমাকে বলল,

—প্লিজ, কাম্ ইন।

তাহলে জারিনারই আসল নাম অলকা। এবং অলকাই সেই মেয়ে যাকে আমি সলিল নন্দীর সঙ্গে সেই আকাশের কাছাকাছি বাড়িতে অদ্ভুত পরিবেশে দেখেছিলাম। এবং বলাই বাহুল্য অলকা আমায় চিনতে পারে নি। উনিশে আর একুশে সমস্ত জগৎ সংসার এত পাল্টে যায় যে দেহ ত ছার ব্যক্তিত্বেও তার হাত লাগে।

আমার নাম সূর্য রায়।

অলকা উজ্জ্বল চোখে তাকাল। তার চোখে হাসি আর আনন্দ ঝকঝক করছিল।

—ঠিক আছে। একটু বসবেন কি ?

আমি বসে পড়লাম ওর সামনের চেয়ারে।

—হাতের কাজগুলো সেরে নিই। আপনার ভয়েস টেস্ট করব তারপর।

আমি হেলান দিলাম।

অলকা বলল,

—চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে আমার বাজি হয়েছে জানেন। আমি বলেছি আপনার ভয়েস 'জিঙ্গল্-'এ দারুণ আসবে।

আমি লজ্জা পেয়ে একটু হাসলাম। একটু ঘামলাম। তারপর মনের ভিতরে কোথাও একটু গর্বও হল।

অলকা বসে বসে নানা রকম চিঠিপত্র, চালান খাতা দেখতে আর সই করতে লাগলো। তারপর আমি হাতে কোনো কাজ না থাকায়, চোখের সামনে আর কোনো আকর্ষণীয় দৃশ্য না থাকায় পত্রিকা উল্টোতে উল্টোতে বাধ্য হয়েই অলকাকেই দেখতে লাগলাম। অলকাকে চৌরঙ্গি পাড়ার ঝকঝকে আপিসের রিসেপ্সনিস্ট এর মতো লাগছিল। তার মাথার চুল সরু সিঁথের দুপাশে দুভাগ করে ঢাল নামিয়ে আঁচড়ানো। শেষের দিকে একটি ঢেউ তোলা। পরনে হাতকাটা কোমর কাটা হাল্কা তসর রঙের চোলি। সেই রঙের ওপর মেরুন কল্কা

প্রিন্ট্ করা ফুরফুরে ছাপা শাড়ি। আমি লক্ষ্য করছিলাম সূতীর শাড়ি এত পাতলা যে তলায় চমৎকার লেশের কাজ করা সায়া দেখা যায়। এত কুশলী আর এত স্মার্ট লাগছিল অলকাকে। একেবারে মেশিনের মতো। স্ট্রীম লাইনড্। চমৎকার সহজ আর সুছন্দ। কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে চোখ তুলে সহাস্যে, আমার সম্বন্ধে দু একটা জ্ঞাতব্য তথ্য জেনে নিচ্ছিল। আমি কোথায় পড়ি, কি করি, কিসে আমার বেশি ন্যাক্, এইসব। কাজ শেষ করে কিছুক্ষণ পরেই অলকা উঠল। হেসে চুলের চমৎকার আর একটি মাত্র ঢেউটিকে দুলিয়ে বলল,

—চলুন, এবার আমাদের ছোট্ট স্টুডিওটি দেখবেন চলুন।

একটি গ্যারেজ স্পেস্‌কে উল্টেপাল্টে দিব্যি একটা স্টুডিও বানানো হয়েছে। আলাদা করে শব্দ-নিরোধক দেওয়াল দিয়ে পুরু করা হয়েছে পাতলা দেওয়াল। বাইরের দরজায় ইলেক্ট্রোপ্লেটিংএর হাতল লাগানো পালিশ করা ভারি দরজা। দরজা খোলার পর অন্ধকার ঘরে ঢুকে অলকা সুইচ টিপে ভিতরের সমস্ত উদ্ভাসিত নিয়ন জ্বালিয়ে দিল। আমি ভিতরে ঢুকে দেখলাম চারদিক আলোয় আলোময়। কার্পেট মোড়া মেঝের ধারে জুতো খুলে রেখে আমরা ভিতরে গেলাম আর ক্রমশ জানলা দরজাহীন বদ্ধ ঘরের গুমোট সরে গিয়ে উপর থেকে ধীরে ধীরে এযার কণ্ডিশনিঙ্এর ঠাণ্ডা নামছে। আস্তে আস্তে আমার শরীরের ঘর্মাক্ত অস্বস্তি, মাথায় ভিতরকার অস্থিরতা ঠাণ্ডা হয়ে জুড়িয়ে এল। অলকা ঝকঝকে মেশিনগুলোর কাছাকাছি গিয়ে নানা রকম স্যুইচ বোতাম অবলীলায় চালিয়ে দিল। স্টীল রঙের মেশিনে লাল সবুজ মণির মতো চালু মেশিনের সংকেত-আলো জ্বলে উঠলো। মেশিনের শরীর থেকে উঠতে লাগলো ঝিম্‌ঝিম্ আওয়াজ। কনট্রোলিং বুথ্ চালু করে স্যুইচ অন্ করে দিতেই মাইক্রোফোনটা বেঁচে উঠল। কি করে বুঝলাম? অলকা মাইক্রোফোনের সামনেকার পাতলা ধাতুর নেটের মতো চাদরের সামনে তুড়ি দিতেই মাইক্রোফোনের মধ্যে থেকে অদ্ভুত একটা কম্পন তরঙ্গ উঠতে লাগল। ড্রয়ার

থেকে ছোট্ট একটা টেপ্ বের করে মেশিনে চাপাল অলকা। তার মেশিন সংক্রান্ত কুশলতা দেখেও আমার যেন কথা সরল না। এবার হেসে চোখ তুলে অলকা বলল,

—নিন মাইক্রোফোনের সামনে যান। গিয়ে একটু কিছু বলুন। একটা কবিতা, কিংবা এক পিস গদ্য।

আমি নার্ভাস গলায় জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন আবৃত্তি করতে শুরু করলাম। প্রথম দিকে গলা দারুণ কাঁপছিল। আমি বোধহয় মাইক্রোফোনের খুব কাছে চলে গিয়েছিলাম। অলকা হাত নেড়ে আমাকে পিছিয়ে যেতে বলেছিল। তারপর শেষের দিকে ওর মুখের ভাব বেশ প্রসন্ন লাগল।

কানে হেড্‌ফোন লাগিয়ে আমার রেকর্ডিং শুনছিল অলকা। মনে হল ও ক্রমশ খুব খুশি হয়ে উঠছে। আবৃত্তি শেষ করেই আমি খুব ছেলেমানুষের মতো বললাম—একটু শোনাবেন না?

অলকা একটা চাবি টিপতেই টেপ্‌টা ফর্ ফর্ করে ঘুরে গেল। অলকা আবার প্রথম থেকে টেপ্ চালিয়ে দিল। আমি অবাক হয়ে শুনতে লাগলাম আমার কণ্ঠস্বর। আমরা নিজেদের নিজেরা কত যে ভালোবাসি! টেপ্ শোনাতে শোনাতে অলকা মাঝে মাঝে টেপ্ থামাচ্ছিল আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল কোথায় কণ্ঠস্বর পড়ে যাচ্ছে, কোথায় আমার উচ্চারণ ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে, এইসব। এবং আমরা দুজনে মাথায় মাথা লাগিয়ে শুনতে শুনতে হঠাৎ দেখলাম কখন দুজনে দারুণ বন্ধু বনে গেছি। টেপ্ শোনা শেষ হয়ে গেলে আমি অলকাকে বললাম,

—কেমন লাগল?

—খুব পসিবিলিটি আছে! দারুণ আসবে কিন্তু!

আমি অলকার কাছ থেকে অলকার করা কয়েকটা জিঙ্গল্ শুনতে চাইলাম। অলকা কয়েকটা শোনালোও।

তার পরেও, সব কাজ শেষ হয়ে যাবার পরেও অলকার কাছাকাছি, সেই ঠাণ্ডা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্টুডিওয়, উদ্ভাসিত নীলাভ আলোর

তলায় আমার বসে থাকতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু আর তো কোনো অজুহাত নেই। পরদিন একটা জিঙ্গল-এ ভয়েস দেবো, এমনি মোটামুটি একটা ঠিক্ঠাক্ হওয়ার পর আমি চলে এলাম। কিন্তু তারপর প্রায় সাতদিন আমি শব্দ-ভারতী অফিসের দিকে পা দিতেও সময় পাই নি।

কারণ সেদিনটাও ছিল জীবনের কারখানা থেকে বেরিয়ে আসা নাট বল্টুর মতো অবিকল দিনগুলোর চেয়ে একটু আলাদা আর একটু বেঢপ। ক্রমাগত ঘটনার ঘনঘটায় ফেটে পড়তে থাকা অলকাদের ওখান থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে আমার মাথার ভিতরটা খুব হাল্কা লাগছিল। সামনেই ময়দান। ময়দানের কিনারা দিয়ে হাঁটছিলাম। আমার ভিতর শুধু একটা শব্দ কাজ করছে। 'সুসংবাদ' 'সুসংবাদ'। দু একটা অনিয়মিত টিউশনি ছাড়া আমি ত তেমন কিছু পয়সা রোজগার করতে পারি নি। এই প্রথম মোটমুটি সম্মানজনক উপায়ে কিছু টাকা আমার হাতে আসতে চলেছে।

আমার মতো বয়সে যখন সিগারেটের খরচ ক্রমশ বাড়তি, যখন জামা-কাপড়ে বেশ খানিকটা বাবুগিরি করার ইচ্ছে ওঠে তখন সেই ত দু হাত পেতে দাঁড়াতে হয় বাবা মার সামনে। আমার এত বিশ্রী লাগে।

এই 'সুসংবাদ'টুকু তাই মাসিমার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমার খুব ইচ্ছে হল। এখন ত পাড়ার কাউকে বা নিজের বাড়ির কাউকে কিছু বলা হবে না। ধরা যাক্ জিঙ্গল্টা শেষ পর্যন্ত হলই না। আমার 'ভয়েস' হয়ত পার্টির পছন্দই হল না। তখন সবাই আমাকে উপহাস করবে। কিন্তু মাসিমাকে এখনই সব বলা যায়। আমার অসাফল্য নিয়ে মাসিমা অন্তত কোনোদিন হাসবেন না।

রুমার সূত্রে মাসিমার সঙ্গে আমার যে আলাপ, তা এই দু বছরে গভীর ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছে গিয়েছে। আমাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা সরু গলিতে একটি বাড়ির ছোট্ট একটি ঘর ভাড়া করে মাসিমা থাকতেন। যে স্কুলটিতে তিনি হেডমিস্ট্রেসের চাকরি করতেন সেই

স্কুলটি ছিল তাঁর ওই বাড়ির খুব কাছে। আমি প্রায়ই মাসিমার কাছে যেতাম। চুপচাপ বসে থাকতাম। মাসিমা তাঁর জীবনেব ছোটখাটো ঘটনার গল্প বলতেন আমায়। এককালে মাসিমা ছিলেন কলেজের অধ্যাপিকা। সেই সময় প্রেম করে রুমার বাবার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। রুমার বাবা বিয়ের সময় ছিলেন সামান্য চাকুরে। মাসিমাকেই তখন স্বামীকে প্রায় প্রতিপালন করতে হত। তখন রুমার বাবা নাকি নানা রকম মানসিক কমপ্লেক্সে ভুগতেন। স্ত্রী বেশি ভালো চাকরি করলে স্বামীদের নাকি ওই ধরনের বিকার হয়। তাছাড়া রুমার বাবার নিত্যনতুন ভালো পোশাক পরা, ভালো খাওয়া দাওয়া করার অভ্যাস তখনও ছিল। সেই সবের জন্য মাসিমাকে অধ্যাপনা ছাড়াও আরও নানান বাড়তি পরিশ্রম করতে হত। মাসিমার সনির্বন্ধ চেষ্টাতেই রুমার বাবার ভালো চাকরি হল। রুমার বাবার ভালো চাকরির পরই মাসিমা পাছে স্বামীর খাওয়া দাওয়া আর সাংসারিক যত্নের অভাব হয়, এজন্য চাকরি ছেড়ে মেয়েকে নিয়ে সানন্দে সংসার পাততে চললেন পুণায়।

মাসিমা আমাকে চা করে দিয়ে স্বপ্নাবিষ্টের মতো যখন সেইসব দিনের গল্প বলে যেতেন তখন মনে হত, মাসিমা যেন সেই ফেলে আসা সময়ের ভিতরে ভিতরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। খুব পরিষ্কার করে ত সব কথা আমাকে বলতে পারতেন না মাসিমা। তবু বুঝতে পারতাম মাসিমার সেই পুণায় থাকতে থাকতেই আস্তে আস্তে সব স্বপ্ন ভেঙে পড়ে। ছোটখাটো খুনসুটি, পতন, এইসব প্রথমদিকে মাসিমা সহ্যই করতেন। কিন্তু যত দিন যেতে থাকে তত বড় বড় দু চারটে ঘটনাও ঘটতে থাকে। শুধু নারীঘটিত ব্যাপারই নয়, আরো নানা ভাবে নীতিশ সাহার মীন্‌নেস্‌ মাসিমার চোখে পড়ে যেতে থাকে। না হলে মাসিমা কলকাতায় ফিরে আবার চাকরিতে ফিরে আসতেন না। সংসার তিনি ভালবাসতেন। ঘরেই ছিল তাঁর স্বস্তি। কিন্তু হয়ত মাসিমা ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন এমন একটা সময় আসতে চলেছে, যখন চাকরিটা তাঁর পক্ষে একেবারে আবশ্যিক হয়ে উঠবে। মাসিমা অবশ্য

আর একটু বাড়তি ভেবেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন নীতিশ সাহা হয়ত রুমাকেও ঠিকমতো দেখাশুনো করবে না। তাই রুমার জন্য তিনি তাঁর মাইনের প্রায় সব টাকাই যক্ষের মতো সঞ্চয় করে রাখতেন।

মাসিমার ঘরটি আমার বড় ভালো লাগত। সরু গলির ধারে ছোট্ট ঘর। ঠাণ্ডা মোছা মেঝে। হয়ত একটু ড্যাম্প। মেঝের একধারে পুরু মোটা মাদুরের ওপর পর পর দু খানি পুরু পাহাড়ী কম্বল ভাঁজ করে সরু বিছানা পাতা। তলার দিকে অর্ধেক বন্ধ জানলার পাটায় একটি জনতা স্টোভ্ আর দুচারখানি বাসন রাখা। লম্বা ধরনের কুলুঙ্গিতে সামান্য কিছু বই। ধর্ম গ্রন্থ টন্থ হবে হয়ত। আর একটি কুলুঙ্গিতে পুরোনো কাপড়ের পাতলা শাদা পর্দা টাঙানো। পর্দার ফাঁক দিয়ে আমি আব্‌ছা আব্‌ছা একটি বাঁধানো ফটোগ্রাফ দেখতে পেতাম। সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আর শ্রীমায়ের ফটোগ্রাফ। দড়িতে মাসিমার দু'চারখানি শাড়ি ব্লাউজ ঝোলান থাকত ব্যস্।

আমি মাসিমার কাছে এসে বসে বড় শান্তি পেতাম। গল্প করতাম। মাঝে মাঝে মাসিমার দু একটা দরকারী সওদা করে দিতাম। বাজার টাজারও। প্রথম প্রথম মাসিমা লজ্জা পেতেন, পরে খুব সহজ হয়ে গিয়েছিলাম।

আমার জন্য মাসিমার মনে একটি আলাদা জায়গা তৈরী হয়েছিল। তিনি হয়ত জানতেন রুমাকে আমি···আসলে রুমাই ত আমার প্রথম দুঃখ! কি ভাবে নিষ্ঠুরের মতো আমাকে রুমা পরিত্যাগ করে গেছে, ছেঁটে ফেলে দিয়ে গেছে, তা হয়ত মাসিমার খুব একটা অজানা ছিল না। মাসিমা চাইতেন জীবনে আমি সফল হই, সুখী হই।

আমি মাসিমার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে জুতো ছাড়লাম। চাপা গলায় ডাকলাম,

—মাসিমা আসবো!

—এসো সূর্য!

ভেজানো দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলাম। মাসিমা চুপচাপ বসে

ছিলেন। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে অলকার কথা শব্দ-ভারতীর কথা, আমার 'জিঙ্গল্' করার কথা সব তোড়ে বলে গেলাম। তারপর আমার বক্তব্য সব শেষ হয়ে যাবার পর হঠাৎ লক্ষ্য করলাম মাসিমা হাঁটুতে থুতনি দিয়ে চুপচাপ অন্যমনা হয়ে বসে আছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম,

—আপনার শরীর খারাপ হয়েছে মাসিমা ?

—না সূর্য !

মাসিমার গলার স্বরটি বসা। ধরা ধরা।

আমি উঠে আলো জ্বেলে দিলাম। একটা ন্যাড়া তার থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া আলোর একটা বাল্ব্। সেই আলোয় দেখলাম মাসিমার চুল এলোমেলো। বোধহয় বিছানায় অনেকক্ষণ শুয়েছিলেন। আমাকে দেখে উঠে বসেছেন। কালো ফিতে পাড় আধময়লা শাড়িটি গায়ে জড়ানো। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম এ সময় মাসিমার জনতা স্টোভটি রোজ যেমন নীল শিখা মেলে জ্বলে আজ তেমন জ্বলছে না। তাঁর ভাত রান্না করার ছোট্ট বাসনটি ধোয়া মাজা, উবুড় করা।

—জানো সূর্য, আজ রুমার বাবা ডিভোর্স পেয়ে গেলেন।

মাসিমার কথা কটি তীরের মতো এসে যেন বিঁধে গেল আমার বুকের মধ্যে। আমি জানতাম রুমার বাবা ডিভোর্সের জন্য আবেদন করেছেন। আর মাসিমা একেবারেই কোনো রকম বাধা দেন নি।

—অবশ্য আমি ত কবেই ওদের কাছ থেকে দূরে চলে গিয়েছিলাম। মনে মনে ওদের দিক থেকে কবেই ত সব শেষ হয়ে গিয়েছিল।

আমি চুপচাপ বসে রইলাম।

মাসিমা আস্তে আস্তে নিজের মনেই কথা বলে চললেন।

—বিয়ের বছর ছয়েক পরে, একদিন রুমার বাবা যখন রাত আড়াইটের সময় বাড়ি ফিরলেন, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম,

—আজ ত তোমার কোনো ফ্লাইট ছিল না। তাহলে এত রাত হল কেন ? তুমি অবশ্য ফ্লাইট্ আছে বলেই বেরিয়েছিলে। তোমার অফিসে ফোন করতে ওঁরা বললেন, আজ নাকি তোমার অফ-ডে ?

উনি রেগে একেবারে টঙ্ হয়ে গিয়ে বললেন, তোমায় কে হুকুম দিয়েছিল ফোন করতে ?

আমি মাথা নীচু করে বলেছিলাম, হঠাৎ পড়ে গিয়ে রুমার ঠোঁট কেটে যায়। স্টিচ্ দিতে হয়, তাই। ভেবেছিলাম তুমি থাকলে একটু সাহস পাবো।

রুমার বাবা কি রকম যেন ঘেন্না করে তাকিয়েছিলেন আমার দিকে। তারপর বলেছিলেন—মাথা ফাটে নি, ঠ্যাং ভাঙে নি, কেবল ঠোঁট কেটেছিল। তাতেই এই কাণ্ড ?

অথচ দেখো সূর্য এর দশ বছর বাদে কেমন বাপেতে মেয়েতে দিব্যি আমে দুধে মিশে গেল। এই ত যাবার আগেই রুমা আমাকে একদিন ডেকে বলল, মা তোমার সাজ-পোশাক একটু বদলাও ত। ওই রকম বাজে পোশাক, ওই বাজে দিদিমণির প্রফেশন আমার আর বাবার একটা প্রেস্টিজ বলে আছে ত। লজ্জা করে। তুমি আমাদের ভিজিটারদের সামনে ওভাবে বেরিও না। কথাটা সত্যি। একদিন রুমার বাবার এক ইটালিয়ান এয়ার-হোস্টেস্ বান্ধবী বলেছিল, নীতিশ তোমার মেড-কে বলো না আমাকে একটু ঠাণ্ডা লাইমজুস্ দিয়ে যেতে। সূর্য এই ভাবেই তো ওরা আমার ওপর থেকে ওদের মন তুলে নিয়েছিল। আমিও নিজেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলাম। তুমি ভেবে দেখো, একটা বাড়িতে শুধু তিনটে শরীর কাছাকাছি আছে মনগুলো আলাদা জায়গায় !

আমি মাসিমাকে দেখছিলাম। কম পাওয়ারের আলোর তলায় কান্না দিয়ে গড়া একটা মূর্তির মতো। মাসিমাকে আমি বাধা দিতে পারছিলাম না। মাসিমা সমানে কথা বলে চলেছিলেন।

—জানো সূর্য, ওই বাড়িতে থেকে আমি আমার দেহটাকে সম্পূর্ণ তুলে আলাদা করে না নিতে পেরে কত যে কষ্ট পেয়েছি। একই ঘরে শুতে হয়েছে আমাকে। উনি খাটে আমি মাটিতে। ওদের মাংস রান্না করে দিয়েছি, তারপর আমার সেদ্ধ ভাত। মদের গন্ধ ভরা

হাওয়ায় বাধ্য হয়ে নিঃশ্বাস নিয়েছি। এক পাশের ঘরে ওদের পার্টি হৈহুল্লোড়, আর একপাশের ঘরে রুমার যা ইচ্ছে তাই, কি ভাবে বাঁধা পশুর মতো সহ্য করেছি। কিন্তু তবু কি ভীষণ মায়া। তবু ভেবেছি আমি সব ভুল ভাবছি, ভুল দেখছি। সব আবার ঠিকঠাক্ হয়ে যাবে। জোড়াতাড়া লেগে যাবে।

তুমি বিশ্বাস কর সূর্য, এতদূর চলে এসেও, ছিঁড়তে ছিঁড়তে একটি শেষ সুতোর টান আজও ছিল। এইমাত্র সব ছিঁড়ে গেল।

আমি দেখলাম মাসিমার চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে গাল বেয়ে পড়ছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পরে আমি নিজেই উঠে গিয়ে জনতা জ্বাললাম। মাসিমা গুঁড়ো দুধ গুলে খেতেন। আমি এককাপ গরম দুধ করে, বিস্কিটের বাক্স থেকে দুখানা বিস্কিট প্লেটে সাজিয়ে মাসিমাকে দিলাম।

মাসিমা মুখ তুলে একবার আমাকে দেখলেন, তারপর বললেন,

—সূর্য তুমি যাও, আমি ঠিক খেয়ে নেবো। বেশ সন্ধ্যে হয়ে গেছে। তোমার মা চিন্তা করবেন।

আমি আস্তে উঠে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গলিতে নেমেছি, মাসিমা জানলা দিয়ে আমাকে ডাকলেন,

—সূর্য, একটু এদিকে এসো !

আমি ফিরে এসে জানলার তলায় দাঁড়ালাম।

জানলা দিয়ে মাসিমার মুখের ছায়া রেখাটাই দেখা যায়।

মাসিমা চাপা, ভারি গলায় বললেন,

—সূর্য, লক্ষ্মীটি, তুমি কিন্তু রুমাকে কখনো ফেল না !

এতদিন পরে রুমার কথা কেন ? সবই ত শেষ হয়ে গেছে।

আমি খানিকটা আশ্চর্য বোধ করেছিলাম।

পরদিন মাসিমার দেহ গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় ফ্যান্ লাগাবার আঁক্‌ড়ি থেকে ঝুলতে দেখা যায়।

ওই ভাবে ঝোলার জন্য মাসিমা পাশের ঘর থেকে একটা চেয়ার চেয়ে নিয়ে এসেছিলেন। আর আমি নিজেই দেখেছিলাম, পায়ের কাছে একটি খালি কাপ আর প্লেট্ পড়ে আছে।

পৃথিবীর একটি মানুষের দেওয়া শেষ নগণ্য স্নেহটুকু গ্রহণ করেছিলেন মাসিমা।

ফলে সাতদিন আমার 'শব্দ-ভারতীর' দিকও মাড়ানো হল না। নীতিশ সাহাকে টেলিগ্রাম্ করা রুমাকে চিঠি লেখা। পুলিশের হাজারো প্রশ্ন সামলানো, মাসিমার ডায়েরী থেকে ঠিকানা খুঁজে বের করে তাঁর বহুদিন আগের সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়া বাপের বাড়ির ঠিকানা বের করে তাঁর ভাইদের কাছে যাওয়া, কত কী। তবু শেষ পর্যন্ত যেমন চেয়েছিলাম আমার রক্তের ভিতরকার সংস্কার অনুযায়ী মাসিমার সৎকার করা গেল না। রুমারা কেউ এল না। মাসিমার ভাইরাও এলেন না। অবশ্য মাসিমা পরিষ্কার ভাবে চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন। ফলে তাঁর আত্মহত্যা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। যাতে কেউ না জড়িয়ে পড়ে। যত্ন করে রাখা ব্যাঙ্কের পাশ বুক্, গড়িয়ায় রুমার নামে কিনে রাখা একটি জমির দলিল এসবই তিনি সুষ্ঠু-ভাবে গুছিয়ে আমার নাম লেখা একটা বড় এন্‌ভেলপে ভরে রেখেছিলেন।

ফলে এত সব দায়িত্ব আমার ঘাড়েই শেষ পর্যন্ত পড়ে গিয়েছিল।

সাতদিন বাদে আবার 'শব্দ-ভারতীতে' গেলাম। সেদিন অলকার চেয়ারে বসে ছিলেন সেই পাউডার মাখা ভদ্রলোক। সুধীন চৌধুরী যার নাম। আমাকে দেখে অমায়িক হেসে বসতে বললেন।

—কি ব্যাপার? সেদিন মিউজিক্ হ্যাণ্ডস, পার্টি, অলকা, আমরা সব অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম কই আপনি ত এলেন না। আপনার জন্য একটা হেয়ারঅয়েলের দারুণ ভালো স্ক্রীপ্ট রেখেছিলাম। অলকার

একদম ইচ্ছে ছিল না ওটা আর কেউ করে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে অশোক হাজরাকেই দিতে হল। অশোক হাজরা ভালোই করে। কিন্তু দারুণ নোন্ ভয়েস ত। ওর গলা সবাই চেনে। অনেক এ্যাড্ভ্যা-টাইজার আছে, তারা আবার ফ্রেশ আন্কোরা ভয়েস চায়।

আমি সুধীন চৌধুরীর কথায় খুব মজা পাচ্ছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম,

—ফ্রেশ ভয়েসটা কি ব্যাপার?

—মানে কি জানেন? ধরুন দুটো আলাদা কোম্পানীর চায়ের দুটো প্রতিযোগী ব্র্যাণ্ড। দুটোতেই যদি একই ভয়েস যায়, অর্থাৎ একই ভয়েস বলে, আমি এই চা খেতেও ভালবাসি, ওই চা খেতেও ভালোবাসি তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়ায়? বুঝলেন অনেক ভেবে চিন্তে তবে কাজ করতে হয়। শুধু নিজের অর্গানাইজেশনে নয়, অন্য অর্গানাইজেশনেও কোথায় কি হচ্ছে কে কোনটায় ভয়েস দিয়ে ফেলছে সবই জানতে হয়।

এমনি সময় গাড়ির চাবি হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে ঢুকল অলকা। আমাকে দেখেই একটু থেমে দাঁড়িয়ে বলল,

—বাঃ, এই ত, খুব ঠিক্ সময়ে এসেছেন দেখছি!

আমি একটু দোষী দোষী মুখ করে হাসলাম।

—আচ্ছা ইরেসপনসিবল্ লোক্ কিন্তু আপনি সূর্য! আসবেন বলে দিব্যি ডুব দিলেন।

অলকার দিকে তাকিয়ে আমার তাকে আমার মাসিমার মৃত্যুর কথা খুব বলতে ইচ্ছে হল। কিন্তু কিছুতেই বলতে পারলাম না। হয়ত ওই সুধীন চৌধুরীর চক্চকে অফিস ঘর কোনো বাধার সৃষ্টি করে থাকবে। তাই অলকার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে চট্ করে একটা মিথ্যে কথা বলে দিলাম। বলে দিলাম আমার দারুণ ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল। জ্ঞান ছিল না একদম।

অলকা হঠাৎ হেসে চৌধুরীর চেয়ারের হাতলে গিয়ে বসে পড়ল।

আমার কেমন যেন দৃষ্টিকটু লাগল ব্যাপারটা। অলকা চৌধুরী সাহেবের কাঁধের পেছনটা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলল,

—আচ্ছা, চৌধুরী সাহেব, উজ্জ্বলা টুথপেস্টের নতুন জিঙ্গলটা সূর্য রায়কে দেওয়া যায় না।

চৌধুরী সাহেব অলকার হাতের পাতার ওপর হাত রেখে হেলান দিয়ে মাথার পেছনটা ওর বুকে ছুঁইয়ে কেমন একটা স্বপ্নলীন কণ্ঠে বললেন,

—কেন দেওয়া যাবে না? খুব দেওয়া যাবে!

অলকা বলল,

—তাহলে সূর্যকে রিহার্স করাই!

নীমিলিত চোখে চৌধুরী সাহেব মাথা নেড়ে সায় দিলেন। অলকা চেয়ারের হাতল থেকে নেমে আমাকে স্টুডিওতে নিয়ে গেল।

ঘণ্টা খানেক বাদে, গোটা দুই কাট্ নেবার পর আবার যখন অফিস ঘরে ফিরে এলাম তখন দেখলাম চেয়ারের মালিক পাল্টে গেছে। এবার মালিক উঠে গিয়ে, বসেছে মালিকানী।

একেবারে ডিগ্‌ডিগে রোগা খেঁকুরে চেহারার দাঁত উঁচু একজন মাদ্রাজী ভদ্রমহিলা বসেছিলেন। তাঁর নাকে চশমা কপালে সাঁই বাবার ভস্ম আর লাল কুঙ্কুম। ট্রানজিস্টার খুলে একমনে শুনছেন আর কাগজে টিক্ মারছেন।

অলকাকে দেখেই তিনি এক গাল বশম্বদ হাসলেন। আমি এমন হাসিহীন হাসি এর আগে আর কখনো দেখি নি।

তারপর অদ্ভুত মাদ্রাজী টানে বললেন,

—তোমার মেশোমশাই বার্মা শেলের অফিসে গেছেন। বলে গেছেন, রিচ্‌বণ্ড-দের সঙ্গে নতুন রেট্‌টা ফাইন্যাল করতে।

অলকা যেন বমি সামলাল। তারপর একধরনের মুখভঙ্গি করে বলল,

—চৌধুরী সাহেব আর কিছু বলেন নি?

—তোমার মেশোমশাই! নাত!

—সে কী? চৌধুরী সাহেব···

—কেন তোমার মেশোমশাই কী?

—নাঃ ওঁর সঙ্গে আমার যে আজ ক্যালকাটা ক্লাবে লাঞ্চ খেতে যাবার নেমন্তন্ন। 'সুপার ফোম'-দের পার্টির লাঞ্চ!

—কৈ তোমার মেশোমশাই ত এসব কথা আমাকে কিছু বলেন নি?

আমি বুঝতে পারছিলাম, কোনো গূঢ় কারণে অলকা ভদ্রমহিলাকে দারুণ চটিয়ে দিতে চায়। অনেকক্ষণ থেকেই সে ভদ্রমহিলাকে রাগানোর চেষ্টা করছিল। এতক্ষণে খানিকটা যেন সফল হল। অবশ্য এক মুহূর্তের জন্যই মাত্র। তারপর আবার ভদ্রমহিলার মুখের রেখাগুলি নরম আর কোমল হতে লাগল। তিনি আবার তাঁর শুক্‌নো ঠোঁটে সেই কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বললেন,

—দেন রাশ হোম ডিয়ার, চেঞ্জ ইয়োর ড্রেস, ইয়োর আঙ্কল মে পিক্ ইউ আপ ফ্রম ইয়োর ফ্ল্যাট্!

অলকা ঘুরে দাঁড়াল। আমার হাত ধরে বলল,

—চলো সূর্য!

আমরা তুজনে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি, একটি বেশ লম্বা চওড়া ফুটিফাটা যৌবনের যুবতী, দৃষ্টিকটু মিনিস্কার্ট আর নাইলেক্সের গেঞ্জী পরে ভিতরে ঢুকতে আমাদের সঙ্গে তার প্রায় ধাক্কা লেগে গেল।

—হাই 'লোকা'।

—হাই 'সনি'!

আমি ঘাম ঘষা চুল আর সেন্টের একটা তীব্র মিশ্র গন্ধ পেলাম। বাইরে বেরিয়ে এসে অলকাকে প্রশ্ন করলাম,

—ব্যাপারটা কি বল ত?

—কোন ব্যাপারটা!

—ওই যে মেশোমশায় আর চৌধুরী সাহেবের ব্যাপারটা।

অলকা থেমে দাঁড়াল।

—কেন? তুমি বোঝো নি সূর্য? ন্যাকা!

আমি বললাম,

—না ত। আচ্ছা ওই হাতির মতো মেয়েটা কে? অলকা হেসে বলল,

—বেশ বলেছ কিন্তু, সত্যি একটা ছোট সাইজের হাতির মতোই বটে!

আমার এক কালের ক্লাশ ফ্রেণ্ড ওই 'সনি' হল, চৌধুরী সাহেবের বড় মেয়ে।

আমি প্রশ্ন করলাম,

—তাহলে?

অলকা আমার দিকে ফিরে, সিধে তাকিয়ে বলল,

—সূর্য, সনি আমার ক্লাশ ফ্রেণ্ড্ হলেও ওর বাবা চৌধুরী সাহেব, কোনো কালেই আমার মেশোমশায় হবে না। বুঝলে। নাও, এখন চল।

আমি বললাম,

—কোথায়?

অলকা বলল,

—এসোই না।

অলকার পিছন পিছন বাইরে এলাম। অলকা একটা শাদা এ্যাম্বাসাডারের পাশের দরজা চাবি দিয়ে খুলল।

অলকা ড্রাইভিং সিটে বসে যখন পাশের দরজাটা খুলে দিয়ে আমাকে ডাকল আমি প্রাণপণ চেষ্টা করলাম না, বলে বাসে চলে যেতে, কিন্তু আবার নানান বিচিত্র কারণে আমার কেন যেন অলকার সঙ্গে থেকে যাওয়ারও একটা প্রবণতা এল। আমি বুঝতে পারলাম আমার সমবয়সী এই মেয়েটিকে আমি একই সঙ্গে ঘৃণা আর হিংসা করছি, এবং সেই সঙ্গে ওর অদ্ভুত সব গুণের জন্য ওকে সমীহও করছি।

এই মিশ্র পুরানো ভাব আমার মধ্যে সেই দুবছর আগের চেয়েও তীব্র বেগ নিয়ে ঘুরে ফিরে এল।

আমি গাড়িতে উঠতেই অলকা স্টার্ট দিয়ে তীব্র বাঁক নিয়ে সাঁ করে গেট পেরিয়ে বেরোল।

রোদপোড়া দিনটির দিকে তাকিয়ে আমি বললাম,

—কোথায় চললে ?

অলকা বলল,

—মেশোমশাই নয়, অথচ বন্ধুর বাবা চৌধুরী সাহেব, আমাকে যে এ্যাপার্টমেণ্টটা দিয়েছেন সেখানে যাচ্ছি। শুনলে না মেশোমশাই নন যিনি, এবং তা সত্ত্বেও যাঁর স্ত্রী কিন্তু আমার মাসিমা, তাঁর কথামত, আমাকে এখন সাজ-পোশাক করতে হবে, তাঁর স্বামী আমাকে তুলে নেবেন। আমাকে পার্টিতে যেতে হবে। আমার কথাবার্তায় তাদের খুশি করতে হবে, যাতে বিজনেস্‌টা আমরাই পাই।

—তাহলে আর আমায় কেন তোমার ফ্ল্যাট পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া অলকা।

আমি বিস্বাদ কণ্ঠে বললাম,

—আমাকে বরং চৌরঙ্গিতে নামিয়ে দাও। আমি বাসে বাড়ি চলে যাই।

অলকা বলল,

—বাড়ি যাবে ? বেশ তোমার বাড়ি কোথায় বল ?

হঠাৎ একটা দুষ্টুমি বুদ্ধি তখনই চেপে গেল আমার মাথায়। আমি টিপ্যিক্যাল ঘটি ডায়ালগে বলে উঠলাম,

—ম্যাডাম আপনার অতবড় এ্যামবাসাডার কি আর অতদূর যেতে পারবে ? আমি আবার থাকি শ্যাম বাজারের শশী সরকার লেনে !

অলকা আচমকা ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে দিল। শরীরের ওপরটা সম্পূর্ণ আমার দিকে ঘুরিয়ে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমি হাসতে হাসতে অলকার দিকে তাকালাম। অলকার চোখের

তারার চারপাশে দ্রুত ঘুরতে ঘুরতে থাকে থাকে উড়ে আসছে সেই দু বছর আগের ববি-মিম্মিদের বাড়ি দেখা হওয়ার পুরোনো স্মৃতি। অলকা এতক্ষণে আমার একুশ বছরকে ভেদ করে আমার সেই পুরোনো উনিশ বছরে পৌঁছেছে।

এবার অলকা স্টীয়ারিং ছেড়ে দিয়ে আমার পিঠে নরম করে একটা কিল মেরে হেসে বলল,

—ইয়ু ভিলেন!

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম তার চোখদুটি ভরে উঠেছে জলে।

—ডু ইয়ু রিমেমবার মাই নটরাজ! সূর্য?

আমি অর্থপূর্ণ স্বরে বললাম,

—অলকা তুমি আমার কাছে সম্পূর্ণ হেরে গেছো, তুমি আমায় চিনতেই পারো নি, অথচ আমি তোমার সব মনে রেখেছি। তোমার সেই শাদা পোশাক, সেই গান, সেই কথা আর, আর সেই ব্রঞ্জের নটরাজ!

—বাট ডু ইয়ু নো সূর্য, আই ওয়াজ রাইট। ছ্যাট ওয়াজ রিয়েলি এ ব্যাড ওমেন্! আমার নটরাজ যে রাতে হারাল, সেই রাতেই ত,…

আমি বললাম,

—কি?

—চলো আমার ফ্ল্যাটে সব বলব!

আমি বললাম,

—থাক্ না। অতদূর যখন সেদিনও যাই নি, আজও নাই বা গেলাম অলকা। এই ত ভালো!

অলকা বলল,

—সূর্য, সেদিন যাওনি অন্যায় করেছিলে। গেলে হয়ত আমি বেঁচে যেতাম। কিন্তু সেদিন ত আমরা বহু বহু দিন আগেই পেরিয়ে এসেছি। আজ আর তোমার কোনো ক্ষতি হবে না সূর্য। কোনো ক্ষয়। তবু

যাক। যখন যেতে চাইছ না তখন চলো ময়দানের পাশের পথটা দিয়ে এক পাক ঘুরে তোমায় চৌরঙ্গিতে ছেড়ে দিই।

আমি বললাম,

—নাঃ, চলো, আজ তোমার ফ্ল্যাটেই যাবো। তোমার আস্তানাটা চিনে রাখা আমার খুব দরকার।

অলকা আমার কোনো কথার উত্তর না দিয়ে চাবি ঘুরিয়ে আবার গাড়িতে স্টার্ট দিল। তারপর হাল্কা পালকের মতো গাড়িটাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল, অথচ রাতে অতসব ঘটবার পর শেষ রাতে, জানো সূর্য, শেষরাতে আমি কেন যেন শুধু তোমাকে স্বপ্ন দেখেছিলাম!

বাইরে হলুদবসন্ত পাখির পালক খসা রদ্দুর। হাওয়া। তীরের মতো দু চারটে ছুটন্ত গাড়ি। খুলে যাওয়া ফিতের মতো পথ।

চৌধুরী সাহেব অলকাকে ফ্ল্যাট দিয়েছিলেন। ট্যাংরার বাড়ি থেকে তার সংসার মুঠো থেকে বের করে এনে নিউ আলিপুরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আর এত সব করার পর আসল নয় সামান্য একটু কুসীদ নিতে এসেছিলেন রাতে। অলকা সবই জানত, সবই আন্দাজ করেছিল। তার ওপর এমন কিছু পাশবিক অত্যাচারও করা হয় নি। তার নিমরাজী ভাবের ওপর তার শরীরটা দখল করা হয়েছিল। এবং এখনও মাঝে মাঝে তা হয়। তবু ওই আর কি!

অলকা হাসল।

—কিন্তু জানো সূর্য সেদিন রাতে, ঘুমন্ত চৌধুরী সাহেবের পাশে শুয়ে শেষ রাতে আমি তোমাকে স্বপ্ন দেখেছিলাম। ওটা আমার একটা পোষমানা স্বপ্ন। এখনও মাঝে মাঝে রাতে, ইচ্ছে করলেই ওই স্বপ্নটা আবার দেখি।

স্বপ্নটা কি জানো, তুমি যেন আমাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছ। তোমার মুখে সেই অদ্ভুত ঘটি উচ্চারণ। সেই একটু হাল্কা ঠাট্টার সুর। তুমি বলে ওঠেছিলে,

—বাঃ জানেন না, শোনেন না, দিব্যি দেখছি আমার পিছু পিছু চলে আসছেন!

আমি বলেছিলাম, যাবই ত, দেখছেন না হাঁটতে কেমন ভালো লাগছে। বেশ কেমন হাওয়ায় হাওয়া হয়ে, হাল্কা পল্কা হয়ে···

সত্যি তোমাকে আর আমাকে হাতে হাত ধরে দেখাচ্ছিল যেন স্লো মোশান পিক্‌চারের ছবির মতো। তুমি যেন আমার কথার উত্তরে আমার সব উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে বলেছিলে,

—কিন্তু আসছেন ত সখ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পারবেন কি? অদ্দূর? আমার বাড়ি যে আবার সেই শ্যামবাজারে, শশী সরকার লেনে।

ইসস্—কতদিন, কতদিন স্বপ্নটা আমার ভিতরে চাপা ছিল সূর্য, কতদিন—

আমি একা একা বিছানা থেকে উঠে সেই শেষ রাতে, আশ্বিনের সেই ভূতগ্রস্ত চাঁদের আলোয়,.একা দাঁড়িয়েছিলাম বারান্দায়। স্বপ্নে দেখা সেই তোমার, সেই আবছা ছেলেটির হাত ধরে হাওয়ার মধ্যে হাওয়া হয়ে হেঁটে যাওয়ার সেই সুখ···

অলকা গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল।

আমার কেমন যেন নিজের ওপরই নিজের রাগ হল। আমার গলা চেপে এল। অলকার সঙ্গে, শব্দ-ভারতীর সঙ্গে, চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে কোনো রকম সম্বন্ধ রাখব না, এ আমি ঠিকই করে ফেললাম। তারপর কর্কশ কণ্ঠে বললাম,

—কৈ তোমার ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলে না অলকা!

অলকা বলল,

—আর নিয়ে গিয়ে কি হবে?

আমি বললাম,

—আমার একটা বিশেষ কাজ আছে তুমি আমাকে এখানেই নামিয়ে দাও।

অলকা বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ি থামিয়ে দিল। আর একটি কথাও বলল না। আমি নেমে দরজা বন্ধ করে দিতেই তার আবছা গলা শুনলাম। —বাই!

আমাকে নামিয়ে দেবার কথাটা কিন্তু আমি সত্যি সত্যিই বলি নি। ওই বয়সে অত সংযমের কথা কি বলা যায়? আসলে আমি খুব অভিমান করেই বলেছিলাম। কিন্তু অলকা বোধহয় আমার কথা সত্যি মনে করেছে।

আমি পাশে ময়দান রেখে ময়দানের গায়ে এলিয়ে পড়া সরু রাস্তাটা ধরে ভিক্টোরিয়ার দিকে মুখ করে দক্ষিণে হাঁটছিলাম। আমার একপাশে চওড়া রাস্তায় ক্রমাগত গাড়ি বাস ট্রাম যাচ্ছে আসছে। আর একপাশে ময়দানটা ফুটে আছে একটা অতিকায় সমুদ্র-পুষ্পের মতো।

সমুদ্র-পুষ্প, কারণ শুনেছি সমুদ্রের তলায় বিরাট বিরাট আশ্চর্য সুন্দর সব ফুল ফুটে থাকে। এক একটা ফুল এক একটা বাড়ির মতো। পাপড়িতে পাপড়িতে রঙ্, শূঁয়ায় শূঁয়ায় রূপ, কেশরে কেশরে মূর্ছনা। তাদের সেই অসামান্য রূপ দেখে, কাছে গেলেই আস্তে আস্তে তারা সিল্কের মতো কেশর দিয়ে বেঁধে, তারপর ধীরে ধীরে টেনে নেয় তাদের গর্ভগৃহে। আর তারও পর সমস্ত রূপ রস যৌবন শুষে নিয়ে ছিব্ড়েটা বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে আবার সুন্দর হয়ে প্রস্তুত হয়ে হাসতে থাকে।

এখন ময়দানে সর্বনাশা একটা বিকেল। চতুর্দিকে গাঢ় হলুদ রোদের রেণু ঝরছে। এত গাঢ় যে যদি জিভ্ পেতে দিই, তাহলে স্বাদ পাবো। ময়দানের সবুজ ঘাসগুলো, সেই কনে-দেখা আলো লেগে অজস্র সর্বনাশা কেশর হয়ে উঠেছে। আমাকে ক্রমশ যেন সেই চোরকাঁটা ছাওয়া বুকের মাঝখানে টানছে মাঠটা।

অলকা এমন একটা বিকেলে আমাকে এইখানে একা নামিয়ে দিয়ে গেল?

আমি কিন্তু তার ফ্ল্যাট দেখতে চেয়েছিলাম। কেন চেয়েছিলাম?

হয়তো তার ফ্ল্যাটটাও একটা অতিকায় সমুদ্র পুষ্প আমাকে সুযোগ পেলেই আস্তে আস্তে গিলে খেয়ে নিত।

অলকা আজ আমায় সব বলেছে। কিছুই বাদ দেয় নি। সেদিন সেই উনিশ বছরের অদ্ভুত সন্ধ্যায় সে তার নটরাজ হারিয়ে ফেলেছিল। তার ব্রঞ্জের নটরাজ। সেই নটরাজ ছিল তার পয়মন্ত অলংকার। অলকার ধারণা নটরাজটি হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সেদিন রাতে তার জীবনের মোড় ফিরে যাওয়ার সম্বন্ধ আছে। হঠাৎ মদ্যপান করলে অমন ধারণা অলকার মতো মেয়েদের হয়। অলকা কি জানত না কেবল তার মুখ দেখার জন্য তাকে একটা ফ্ল্যাট দেওয়া হচ্ছে না? সঘৃণায় এতটা ভেবে আবার আমি অন্য কথা ভাবতে লাগলাম।

সে ভাবনায় কোনো রকম ঘৃণা নেই। অন্ধকার ফ্ল্যাটে আমি সম্পূর্ণ অন্য একটা কারণে যেতে চেয়েছিলাম। আমি জানি, আমার ভিতরে কে যেন আপনা থেকে বলে দিয়েছে, অলকা কখনো আমার কোনো পতন, কোনো ক্ষতি ডেকে আনবে না। সেই রাত্রির ব্যর্থ ডাকের পর, সে আর আমাকে ফিরে এমন ভাবে ডাকবে না, যাতে আমি নষ্ট হই, পতিত হই। আমি অলকার ফ্ল্যাট দেখতে চেয়েছিলাম এই বিকেলের মতোই একটা নরম রঙীন কারণে।

ওই ফ্ল্যাটে, সুধীন চৌধুরীর পাশে শুয়ে অলকা এক আশ্বিনের মধ্য রাত্রে, জ্যোৎস্নায় ভিজে যেতে যেতে আমাকে স্বপ্ন দেখেছিল। অলকা আজো নাকি মাঝে মাঝে আমাকে স্বপ্ন দেখে।

কেন?

আমি যদি অলকার ফ্ল্যাটে যেতাম তাহলে হয়তো সোজা চলে যেতাম ওর শোবার ঘরে। ওর বিছানায়। যেখানে শুয়ে অলকা আজও এই জটিল জীবনেও তার উনিশ বছরের সেই পবিত্রতা খুঁজে বেড়ায়। ঘুমের মধ্যে জ্যোৎস্নায় ভিজে ওঠে। উঠে দাঁড়ায় তার ভিতরের স্বপ্ন-প্রতিমা। তারপর আস্তে উড়ে যেতে থাকে আকাশের জ্যোৎস্নার দিকে।

আমিও অলকার মতো স্বপ্ন দেখতে চাই। যা কোনোদিন এই বাস্তব পৃথিবীতে ঘটবে না আমাদের সেই অল্প বয়স, সেই পবিত্রতা, যা বয়স্ক মানুষের মলিন হাতের ব্যবহারে ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে আমাদের আরো তুটো বয়স্ক রুক্ষ হৃদয়হীন নীচ পরস্বাপহারী পুরুষ আর রমণী করে তুলবে না, সেই পবিত্রতা ধারণ করে আমিও অন্তত স্বপ্নে কিছুটা রেহাই পেতে চাই।

বিকেল ক্রমশ গাঢ় কমলা হয়ে আসছিল। অলকার ফ্ল্যাট কোথায় জানি না। না হলে ঠিক হাঁটতে হাঁটতে চলেই যেতাম। কিন্তু চাইনে, নাইবা গেলাম অলকার ফ্ল্যাটে। শশী সরকার লেনের সূর্য যদি স্বপ্নে অলকার ফ্ল্যাটে চলে যেতে পারে, তাহলে অলকাই বা কেন সূর্যের গলির মধ্যেকার জীর্ণ-ফ্ল্যাটে এসে দাঁড়াতে পারবে না?

আমিও আজ রাতে শোবার আগে অলকার কথা ভাবব। ভেবে অলকাকে সোজা উড়িয়ে আনব আমার বিছানার পাশে, আমার বাহু উপাধানে। আমার শশী সরকার লেনে।

—আরে সূর্য না?

আমি চমকে পাশ ফিরে দেখলাম, রাস্তা পেরিয়ে যেখানে ভিক্টোরিয়ার ফুটপাথে উঠতে যাচ্ছি, একটা ঢাউস গাড়ি এসে থামল। বিশাল গাড়ি। কোনো ফরেন গাড়ি টাড়ি হবে হয়ত, আমি ঠিক চিনি না। ভিতরে ভেলভেটের কভার দেওয়া। গাড়ির মধ্যে প্রায় ডুবে বসে আছে মালিক। মালিকের পরনে বিলিতি স্যুট্, বাটন্‌হোলে গোলাপ, পাশে মস্ত একটা ফুলের তোড়া রাখা।

—তুই সলিল না?

—হ্যাঁ, উঠে আয়! নর্থে যাবি তো?

আমি এবার হেসে ফেললাম। নীচু হয়ে গাড়ির জানলা দিয়ে ঝুঁকে বললাম,—আবার ভানুমতীর খেলা দেখাবি নাকি?

মালিক বলল, নাঃ দেখাব না। স্টীয়ারিঙ্ আজ নিজের হাতে নেই। দেখছিস না ড্রাইভার চালাচ্ছে।

আমি দরজার হাতল ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। তাজা গোলাপের গন্ধে গাড়ি একেবারে ম' ম' করছে। অদ্ভুত যোগাযোগ, সেদিন সলিল আমায় ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল, অলকা তুলে নিয়েছিল আমায়। আজ অলকা আমায় ছেড়ে দিয়ে গেলো, সলিল এলো তুলে নিতে।

আমি বললাম,

—তুই খুব বড় মানুষ হয়েছিস না সলিল !

—হ্যাঁ, এত বড় মানুষ হবো তা নিজেই ভাবতে পারি নি।

—কি করে হলি ?

—বৌ-এর কপালে।

—এত ফুল নিয়ে যাচ্ছিস কোথায় ? বৌ-এর কাছে ?

—নাঃ যাচ্ছি এক ভদ্রমহিলার কাছে !

—আবার রহস্য ! ভাই সলিল সেদিন, সেই উনিশ বছর বয়সে আমাকে তুমি যে স্কাইস্ক্রেপারের খেলা দেখিয়েছিলে তার জের আজও এই একুশ বছর বয়সেও কাটাতে পারি নি। আর নয় ভাই···

সলিল তার অনেকগুলো আঙ্‌টি পরা ভারী হাতটা আমার হাতের ওপর রাখলো।

—নারে, বেশি ভয় পাস না। আমি বাড়িতেই যাচ্ছি। বৌ সাতটার মধ্যে ফিরতে বলে দিয়েছে। মাঝপথে কেবল এই ফুলটা পৌঁছে দেওয়া। তারপরেই তোকে নামিয়ে দেব। তোদের বাড়ির কাছেই।

গাড়ি চলতে লাগলো। অদ্ভুত শব্দহীন একটা গাড়ি। চলছে কি গড়াচ্ছে তার ঠিক নেই। এইটুকু বুঝতে পারলাম যে আদৌ কোনো রকম ঝাঁকুনি নেই গাড়িটার। কেবল একটা মোলায়েম গতি আছে। সলিল টুক্‌টাক্ প্রশ্ন করছিল। পড়াশুনো, প্রেম করছি কিনা ? পুরোনো বন্ধু-বান্ধবরা কে কোথায় এই সব। সলিলের মুখটা আরো পরুষ হয়ে গেছে। চোখের কোলে অল্প কালি। তার কথা-

বার্তা অনেকটা সংযত আর গভীর লাগছিল আমার। অথচ সলিলের বয়স আমায় চেয়ে কত আর বেশি হবে বড় জোর পাঁচ,—ছয়!

আমি বললাম,

—তুই খুব বদলে গেছিস সলিল, কেমন অন্য রকম লাগছে তোকে!

সলিল আমার দিকে তাকিয়ে শূন্য কণ্ঠে বলল,

—তাই নাকি!

আমি বললাম, যাঁর জন্যে ফুল নিয়ে যাচ্ছিস সে কি তোর লেটেস্ট?

সলিল বলল,

—চল না, গিয়েই দেখবি!

খানিকক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ ট্রাফিকের সিগন্যালে গাড়ি থামলো। সলিল বলল পাশের ফুটপাথে তাকিয়ে দেখ। দেখলাম একটি মেয়ে বাসস্ট্যাণ্ডে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে দুটি ইতর শ্রেণীর যুবক বার বার তার দিকে ঘনিয়ে আসছে। সলিল হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল,

—এখনো এই চলেছে। মেয়ে দেখলেই মাংসের গন্ধ পাওয়া। একটা মেয়েকে আপন মনে একলা থাকতে দেবে না কেউ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে!

আমি অবাক হয়ে বললাম, কি ব্যাপার! এত উত্তেজিত কেন?

—রমলা একলা থাকতে চেয়েছিল। এছাড়া তার আর কোনো দোষ হয় নি।

—রমলা কে?

—একজন মেয়ে। তার স্বামী ছিল মাতাল বদমায়েস। রমলা অফিসে চাকরি করত। স্বামীটা পয়লা তারিখে অফিসের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকত। বলত, 'যদি টাকা না দাও তোমার অফিসে গিয়ে হামলা করব। সকলের সামনে দিয়ে ঝুঁটি ধরে হিড়হিড় করে টানতে

টানতে নিয়ে আসব। নাহলে সোজা ঢুকে যাবো তোমার বসের ঘরে। তোমার আসল চরিত্রটা কি ভালো করে বলে দিয়ে আসব'।

রমলা ভয়ে আতঙ্কে অর্ধেক টাকাই তুলে দিত স্বামীর হাতে। রমলার একটা ছোট্ট ইচ্ছে জন্মাচ্ছিল ভেতরে ভেতরে। সে একা হবে। একলা থাকবে। যেখানে কোনো পুরুষ নেই। সিগারেটের গন্ধ নেই। মদের গন্ধ নেই। সেইখানে চার দেয়ালের মাঝখানে পুরুষহীন একা থাকবে। তেমনি একা হবার জন্যে বুঝলি সূর্য বেচারী রমলাকে কিন্তু আবার একটা পুরুষই ধরতে হল। তার স্বামীর চেয়ে বলশালী একটা পুরুষ যে তাকে তার স্বামীর অসহনীয় অত্যাচার থেকে বাঁচাবে।

—তা তুই এই রমলার কথা জানলি কি করে? রমলা তোর কে?

—আমি রমলার একমাত্র পুরুষ যাকে সে সব কথা অকপটে বলত। তার ছোট বেলার পুতুল খেলা থেকে বড় বেলার পুরুষ-খেলা পর্যন্ত। আমি রমলার সব জানতাম। আহা তার গালের সেই গোল তিলটাকে পর্যন্ত! রমলা হাসলে তার গালের টোলের মধ্যে সেই তিলটা টুপ্ করে ডুবে যেত। এত ভালো লাগত তখন।

গাড়ি চৌরঙ্গী ছাড়ল। সলিল একটা সিগারেট ধরিয়ে আমায় একটা অফার করল। তারপর বলল,

—পুরুষের পর পুরুষ, তারপর আরো পুরুষ। রমলার চাকরি গেছে। তার রেস্ত চাই। তার ভবিষ্যৎ আছে। সে কিছু চায় না সে শুধু কলাকৌশল করে, ছলে বলে এমন টাকা সংগ্রহ করতে চায়, যাতে সে শুধু একটা ঘরে একলা থাকতে পারে। এমন একটা ঘর, যে ঘরে এ্যাশট্রে নেই। এ্যাশট্রেতে পোড়া স্তূপাকার সিগারেট নেই, খালি মদের বোতল নেই, কোনো পুরুষের পোশাক আর মাথার বালিশ নেই।

কিন্তু রমলার সে সাধ মেটে নি। অনেক দিন তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। ইতিমধ্যে সে মদ ধরেছিল। সে সব ভুলে

থাকতে চাইত। সে যে পুরুষ বিদ্বেষেই পুরুষের সংসর্গ করে তা কে আর বুঝতো বল্, কারণ যা বলবার সে তো কেবল আমাকেই বলত…

আমি ধোঁয়া ছেড়ে বললাম,

—এখন সে থাকে কোথায় ?

—চল না দেখবি ! ড্রাইভার, রমা মাইজিকো পাস্—

ড্রাইভার চকিতে পিছনে তাকিয়ে গাড়ি ঘোরালো।

ক্রমাগত গলি থেকে আরো সরু গলিতে পাক খেয়ে যাচ্ছে গাড়ি। একটি নড়বড়ে বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামলো। সামনে পুলিশের গাড়ি। এ্যামবুলেনস্। সলিল নামতেই পুলিশ ইনসপেক্টর বললেন, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি !

সলিল ফুলের তোড়া হাতে মাথা নুইয়ে বলল, ধন্যবাদ ! আমি সলিলের পেছন পেছন নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে তিনতলায় গেলাম। সেখানে দরাজ একটি পুরোনো ধাঁচের ফ্ল্যাটের দরজা হাট করা। পুরোনো আসবাব সাজানো বাইরের ঘর খাবার ঘর পেরিয়ে ভিতরে গেলাম। বিছানার ওপর শোয়ানো আছে আপদমস্তক চাদরে ঢাকা একটি মৃতদেহ।

একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল। বলল,—দুদিন ধরে মরে পড়ে আছেন। হার্ট ফেলিওর। কেউ খোঁজও করে নি। দুধওয়ালার সন্দেহ হওয়ায় ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেয়। ওরা বলছিলেন খুব লোন্‌লি মহিলা। কেউ নাকি খবর নিতেও আসত না।

সলিল আস্তে আস্তে ফুলের তোড়াটা পায়ের কাছে রাখল। তার পর রুদ্ধ কণ্ঠে বলল।

—মুখটা একবারটি দেখবো !

আস্তে ঢাকা তুলে দিলেন পুলিশের লোকটি। আমি চম্‌কে উঠলাম। আমি ভেবেছিলাম কোনো তরুণী হবে। শুক্‌নো এক প্রবীণার মুখ ! শান্ত স্তিমিত দুটি চোখ। টানা ছাঁচের চোখ মুখ। হয়তো কোনো দিন কুমারীই ছিলেন।

সলিল সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

গাড়িতে বসলাম পাশাপাশি। গাড়ি ছেড়ে দিল।

সলিল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

—আমার বাবার অনেকগুলি এ্যাফেয়ারের একটি। আমাকে খুব দেখতে চাইত বলে আসতাম। খুব ভালোবাসতাম। আমার কাছে নিজের মনের সব কথা উজাড় করে দিত। জীবনের শেষ দিনগুলোয় প্রায় জ্ঞান থাকত না এত ড্রিংক করতেন। মাইনে দিতে পারতেন না বলে দাসীরাও থাকত না। বাবা মারা যাবার পরও ওঁর মাসোহারা বন্ধ করি নি। তবে সেই ছোট্ট সলিল তো নই আর। কোনো রকম টান অনুভব করতাম না। তাই গত সাতআট বছর আর দেখতেও আসি নি। পুলিশের কাছে খবর পেয়ে এই এলাম। ভাব একবার সূর্য, দুদিন ধরে মরে পড়ে আছেন কেউ খোঁজও করে নি। এই হলো একা থাকতে চাওয়ার পুরস্কার। এই সব মেয়েদের শেষ জীবনে এই-ই লেখা থাকে?

বাড়ির কাছে প্রায় এসে গিয়েছিলাম হঠাৎ আমার সমস্ত ভিতর থেকে আর্ত একটা কান্না উঠতে লাগলো। আমি সলিলের দিকে ফিরে বললাম,

—সলিল, আমার একটা উপকার করবি?

--কিরে? বল?

ভারী গলায় বলল সলিল।

—গাড়িটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবি 'শব্দ-ভারতীতে'।

—কেন?

—আমি সেখান থেকে ঠিকানা নিয়ে অলকা বলে একটি মেয়ের ফ্ল্যাটে যাবো।

—অলকা? যাকে সুধীন চৌধুরী ফ্ল্যাট করে দিয়েছে?

—হ্যাঁ।

—বলতে হয়, ওখানে আমরা কত গেছি। প্রায়ই তো পার্টি হয়। চল পৌঁছে দিচ্ছি!

গাড়ির কোণে ছোট হয়ে বসে আমি ভাবতে লাগলাম, তোমাদের পার্টিতে যতই নাচুক, গান গাক অলকা, আমার নিজের আলাদা অলকাকে তোমরা জানো না সলিল। যেমন, তোমার রমলাকে তার সময়কার কোনো ঘনিষ্ঠতম পুরুষও জানত না। আমার চোখের সামনে একাকী প্রবীণা রুগ্ন এ্যালকহলিক রমলার তু'দিনের বাসী মড়ার চেহারাটা ভাসছিল। একা একটা ফ্ল্যাটে অলকা কি অবিকল রমলার মতো জীবন শুরু করেছে? সুধীন চৌধুরী আর কতদিন? তারপর? সেই এক গল্প। পুরুষের পর পুরুষ। ঘটনার পর ঘটনা। যতদিন যৌবন। ততদিন জীবন। তারপর?

না। অলকার তুধওয়ালা এসে তার তুদিনের বাসী মড়াকে আবিষ্কার করবে, সে আমি কোনোদিন হতে দেব না। আমি অলকার কাছে যাবো। অলকার ফ্ল্যাটে যাবো। আমি অলকাকে···

সলিলের গাড়িটা এসে বালিগঞ্জের একটা চমৎকার ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে দাঁড়াল। আমরা সবে নেমে দাঁড়িয়েছি। সামনেই দেখলাম কালো একটা বুইক্।

সলিল বলল,—এটা সুধীন চৌধুরীর গাড়ি।

বলতে না বলতেই অলকা আর সুধীন চৌধুরী গল্প করতে করতে নেমে এল। অলকাকে চেনা যায় না এত সেজেছে। দোকান থেকে ফেরানো মোম ঘষা চুল। পরনে শাদা লেস আর রূপোলী জরির ম্যাক্সি। শাদা সাটিনের কোর্ট-স্যু আর ঝুটো মুক্তোর কাজ করা হ্যাণ্ডব্যাগ্।

আমি এগিয়ে যেতেই হাত নেড়ে অদ্ভুত হেসে বলল,

—সূর্য আর তো তোমায় সময় দিতে পারব না। আমরা এখন পার্টিতে যাচ্ছি, ক্যালকাটা ক্লাবে! হিষ্টিরিয়া রুগীর মতো হেসে উঠলো অলকা।

অলকা আর সুধীন চৌধুরী গাড়িতে উঠলো। ড্রাইভার ড্রাইভ করছিল। ওরা তুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছিল ব্যাক্ সীটে। আমরা ঘনিষ্ঠ মাথা তুটো দেখতে পাচ্ছিলাম।

সলিল বলল,—ব্যাপারটা বুঝলাম না সূর্য, কি বল তো ?

অপমানে, হতাশায় আমার ঠোঁট কাঁপছিল। আমি বললাম,

—সারাক্ষণ কি অদ্ভুত ভাবছিলাম। ভাবছিলাম অলকাও বুঝি রমলার মতো একা একা ওর ফ্ল্যাটে মরে পরে থাকবে ?

—মরে থাকবে ? অলকা ?

সলিল হেসে উঠলো।

—ও মেয়ে মরতে আসে নি। মারতে এসেছে। দেখলি না কি ড্রেস। একেই বলে ড্রেস্ টু কিল।

আমি প্রায় ছুটতে ছুটতে সলিলের গাড়িতে উঠে পড়লাম।

তারপর নীচু গলায় কেবল নিজেকে শুনিয়ে বললাম,

—হে ঈশ্বর অলকার সঙ্গে আমার যেন জীবনে কখনো কোথাও দেখা না হয় !

বছর তিনেক বাদের কথা বলছি।

আমি এম. এ. পাশ করে রিসার্চের শেষ পর্যায়ে। বাংলা সাহিত্যের ছাত্রদের যে সব বাতিক থাকে বলাই বাহুল্য সে সব আমার হয়েছে। একটু সাহিত্য টাহিত্য করি। পত্রিকা বের করি। আর চাকরির এ্যাপ্লিকেশন ছাড়ি কলেজে কলেজে।

এমনি সময় একদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে সারাদিন কাটিয়ে বাড়ি ফিরেই দেখি মায়ের ছোট্ট খুপরি রান্না ঘরটার সামনে মোড়া টেনে একটি মেয়ে বসে আছে। মেয়েটির মাথায় একতাল চুলের এলো খোঁপা, পরনে হাল্কা ছাপা পাতলা শাড়ি।

আমাকে দেখে মা বললেন,

—সূর্য দেখে যা কে এসেছে !

সেই আবছা অন্ধকারে আমার দিকে না ফিরেই রুমা বলেছিল,

—সূর্য কেমন আছ ?

রুমা ? আমার অবাক লাগছিল। এমন নরম করে কথা বলা এমন কোমল ভঙ্গি, এমন এলোখোঁপা আর কোমল ভাব রুমার ? কি রকম একটু অস্বাভাবিক ঘটনা না ?

আমি কোনো মতে উত্তর দিলাম,

—ভালোই আছি।

তারপর চলে গেলাম আমার নিজের ঘরে।

রুমা খানিকক্ষণ বাদে এককাপ চা নিয়ে আমার ঘরে ঢুকল। লক্ষ্য করলাম তার একটি পা কেমন টেনে টেনে চলছে। চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রুমা যখন সোজাসুজি আমার দিকে তাকাল তখন লক্ষ্য করলাম রুমার বাঁ গালে একটা বিশ্রী ক্ষতের শুকনো চিহ্ন।

আমি চাপা গলায় বললাম,

—রুমা, এমনটা হল কি করে ?

—কমল খান্নার স্কুটারে এ্যাকসিডেন্ট হয়ে। ও এত জোরে ড্রাইভ করেছিল আমি প্রায় তিনচার ফুট দূরে ছিটকে পড়ে যাই।

শাড়ির আঁচল দিয়ে নিজের বিকৃত বাঁ গালটা আড়াল করতে চাইল রুমা।

—খান্নার খবর কি ?

—কোনো খবর নেই।

রুমা বলল।

—কোন খবর নেই মানে ?

—কমল হরিয়ানায় চলে গেছে, অন্য কিসব ব্যবসা নিয়ে।

—তা তুমি কমল খান্নার সঙ্গে হরিয়ানা গেলে না কেন ?

কেমন উদাসী হাসল রুমা। কোনো উত্তর দিল না।

আমার ক্রমাগত প্রশ্নের তোড়ে আস্তে আস্তে মুখ খুলল রুমা। পুরো কাহিনীটা শোনা গেল।

এ্যাকসিডেন্টের পর থেকে কমল খান্নার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। নীতিশ সাহা আর মিলি দত্ত বিয়ে টিয়ের পরোয়া

না করেই একসঙ্গে বসবাস করতে শুরু করেছিল। দুজনেই ভালো চাকরি করে। ফাস্ট্ লাইফ পছন্দ করে। তাই তাদের দিন কাটছিল দারুণ ফুর্তিতে। ক্যাবারে, পার্টি, মদ, ব্লু ফিল্ম্-শো, ফ্লোর-শো এই সবেই তারা মেতে থাকত। দুজনে একই সঙ্গে ডিউটি নিয়ে চলে যেত বিভিন্ন বন্দরে, ভারতে কিংবা ভারতের বাইরের নানান জায়গায় দু-একদিন করে কাটিয়ে আসত। হোটেলে হোটেলে চলত ওদের নিত্য নতুন হনিমুন। এই সবের সঙ্গে আবার আরো সব ঘটনাও ঘটছিল। যেমন নীতিশ সাহা দিল্লীতে না থাকলে মিলি দত্তর অন্য সব ফষ্টিনষ্টি। আবার মিলি দত্তকে বাদ দিয়ে নীতিশ সাহার আলাদা গোপন নারী ঘটিত ব্যাপার। এই সব ঘটনা জানাজানি হলে দুজনের মধ্যে দারুণ অশান্তি, মারামারি, পেটাপিটি, ঝগড়া বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি —এই সব।

সুতরাং এত ঘটনা বহুল জীবন হওয়ার জন্যেই বোধহয় রুমার বাবা আর মিলি দত্ত প্রায়শই রুমার খোঁজ নিতে ভুলে যেত। রুমার হোস্টেলের ফি, জামাকাপড়ের খরচ, রুমার অসুখ-বিসুখ এসব ঠিকঠাক দেখা হত না। আবার যখন রুমার কথা মনে পড়ত তখন আমোদে হুল্লোড়ে উপহারে আদরে ভাসিয়ে দিত রুমাকে।

প্রায় মাসখানেক নীতিশ সাহা আর মিলি দত্তর কোনো রকম সাড়াশব্দ না পেয়ে, রুমা একদিন হোস্টেল থেকে ছুটি নিয়ে মিলি দত্তর ফ্ল্যাটে গেল।

বেল্ টিপে লাউঞ্জে দাঁড়িয়েই রয়েছে দরজা আর খোলে না। খানিক্ষণ বাদে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো মিলি দত্ত। অন্য সময়ে রুমাকে দেখলে,—ওঃ সুইটি বলে একেবারে জড়িয়ে ধরে আদর করে। মিলি দত্ত, সেদিন সে সব কিছুই করল না। তার দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরোতে লাগল।

—কি ব্যাপার ? তুমি আবার কিসের ধান্দায় এসেছ। এখানকার মধু ফুরিয়েছে। তোমার জানোয়ার বাবাটাকে আমি লাথি মেরে বের

করে দিয়েছি, এবার তোমাকেও বলছি আর আমার ফ্ল্যাটে পা মাড়াবে না।

এই সব কথার সঙ্গে সঙ্গে ধড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল মিলি দত্ত।

হতবাক্ রুমা তখন আর কোথায় যায়? তার বাবার ঠিকানাও সে জানত না। যতদূর খবর রাখত তার বাবা শেষের দিকে নিজের ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে মিলি দত্তর সঙ্গেই পাকাপাকি ভাবে বাস করছিল। রুমা অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে নীতিশ সাহার অফিসে খোঁজ-খবর নিয়ে আবিষ্কার করে যে নীতিশ সাহা অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে এখন বসবাস করছে। মেয়েটি আরো সুন্দরী আরো ধনী। একটি ইটালিয়ান মেয়ে। রুমা প্রায় দেড় দু মাস ঘোরাঘুরি করেও তার বাবার দেখা পেল না। শেষ পর্যন্ত বাবার বন্ধুদের কাছ থেকে খবর পেল রুমার বাবা নাকি তার নতুন প্রেমিকাকে নিয়ে ভারতবর্ষ ছেড়ে বহুদূরে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাচ্ছে। আর ভারতীয় নাগরিকই থাকছে না। একেবারে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক হয়ে যাচ্ছে। টাকার অভাবে রুমাকে শেষ পর্যন্ত হোস্টেল ছাড়তে হল। অনেক কাঠখড় পোড়াবার পর বাবার সঙ্গে দেখাও হল রুমার। এবং রুমার বাবা রুমাকে কলকাতায় তাঁদের এজমালি বাড়িতে তাঁর বড় দাদার কাছে ফিরে যেতে বললেন। তিনি খুব উদারতাও দেখালেন।

তাঁর ভাগে যে টুকু সম্পত্তি পড়ে সেটুকু নাকি রুমার জন্যই রইল। তাছাড়া রুমার মায়ের রেখে যাওয়া টাকা।

রুমা এখন বড় হয়েছে তার আর কি চাই? তিনি চলে গেলে, দিল্লীতে রুমাই বা কার কাছে থাকবে। তার চেয়ে কলকাতায় গিয়ে থাকা নাকি অনেক দিক থেকে সুবিধাজনক।

এবং অবশ্যই রুমার বাবা একবারও বললেন না যে রুমা তাঁর সঙ্গে অস্ট্রেলিয়াও যেতে পারে।

রুমার কাহিনী যখন শেষ হল, তখন আমি হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে বললাম,

—অতএব পুনর্মূষিকো ভব !

রুমা আমার কথা ঠিক শুনতে পায় নি বোধ হয়, জিজ্ঞেস করল,

—কি বললে ?

আমি একটু হেসে বললাম,

—ওঃ তুমি ত আবার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছ। তুমি তো ঐসব সংস্কৃত-টৃত বুঝবে টুঝবে না।

রুমা আমার কথা কানে না নিয়ে বলল,

—থাক্‌গে আমি এখন কলকাতাতেই থাকছি।

—কোথায় ?

—জ্যাঠামশায়-এর কাছে, গোয়াবাগানে, আমাদের বাস্তুবাড়িতে !

—এখন কি করবে ঠিক করেছ ?

—বি.এ.টা পড়ে ফেলি। সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করে বসেছিলাম দিল্লীতে। মায়ের টাকাগুলোর এবার ব্যবস্থা করতে হবে। আর সূর্য আমি, আমি তোমার এ্যাড্‌ভাইস্ চাই !

রুমার নিজের মুখটা সূর্যমুখী ফুলের মতো আমার দিকে যেন একেবারে তুলে ধরল।

আমি এবার হেসে ফেললাম। রুমা গায়ে পড়ে আমার কতখানি অপমান সহ্য করতে পারে সেটাই দেখার চেষ্টা করছিলাম। বললাম,

—এবার তুমি যা শুরু করলে রুমা, তা একেবারেই ছেঁদো কথা। আমি তোমাকে কি এ্যাড্‌ভাইস দেবো ? চাকরি বাকরি কিছুই করি না। সামান্য রিসার্চ স্টুডেণ্ট মাত্র। আমি টাকা-পয়সা, হিসেব নিকেশের কি বুঝি ?

রুমা তবুও চুপচাপ আমার মুখের দিকে চেয়ে, যেন তীর্থের কাকের মতো বসে রইল।

আমার কেমন যেন ঘেন্না ঘেন্না করছিল। চায়ে চুমুক দিয়ে, একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি বললাম,

—রুমা জানো, শেষ দিন পর্যন্ত মাসিমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ

ছিল ! আমি মাসিমার ডেড বডি দেখেছিলাম। নীতিশ সাহা না হয় মাসিমার কেউ নয়, কিছু নয়, কিন্তু তুমি তো তাঁর নিজেরই মেয়ে ছিলে রুমা !

রুমা আর্তস্বরে বলল,

—আমি বুঝতে পারি নি সূর্য, আমি ছোট ছিলাম, ইম্‌ম্যাচিওর ছিলাম !

—তোমার লজ্জা করে না, যে মাকে তুমি দেখতে পর্যন্ত আস নি, একটা পারলৌকিক ক্রিয়া পর্যন্ত কর নি যাঁর, আজ তাঁর রেখে যাওয়া টাকা পয়সা বুঝে নিতে এসেছ !

রুমা ওঠে দাঁড়িয়ে আমার ঠোঁটের ওপর ওর ঘামে ভেজা আঙুল ক'টি চাপা দিয়ে বলেছিল,

—সূর্য আর বলো না। দেখছ ত, শাস্তি ত হচ্ছে আমার, বল, হচ্ছে না ? এত বড় একটা এ্যাকসিডেন্ট্ হল। কমল আমাকে বিট্রে করল, মিলি দত্ত আমাকে প্রায় লাথি মেরে ফ্ল্যাট থেকে তাড়িয়ে দিল, বাবা হোস্টেলের খরচ দিল না। আর এখন ত বাবা আর ইণ্ডিয়ানই নয় ! এখন অন্তত তুমি আমায় দূরে সরিয়ে দিও না। রুমা প্রায় আমার বুকে মাথা রাখতেই যাচ্ছিল।

আমি রুমাকে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিলাম। আমার মধ্যে তখন তীব্র রাগ আর ঘৃণা পাক খেয়ে ফিরছে। আমি দুহাত জোড় করে রুমাকে শুধু বলেছিলাম,

—রুমা আমার মাথায় আগুন জ্বলছে, তুমি দয়া করে আমার সামনে থেকে আপাতত চলে যাও !

রুমা আস্তে আস্তে উঠে চলে গিয়েছিল।

আর রুমা চলে যেতেই, জগৎ অন্ধকার করে ভেসে উঠেছিল মাসিমার সেই গলির ঘরের আলোকিত জানলা। জানলার ফ্রেমে মাসিমার সেই মুখ।

—সূর্য, তুমি কোনোদিন রুমাকে ফেল না।

আমি পরদিনই গোয়াবাগানে রুমার জ্যাঠামশায় ক্ষাতিশ সাহার বাড়ি গিয়েছিলাম।

বছর দুইএর মধ্যে আমার আর রুমার জীবনে আর বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটে নি। কেবল আমি মেদিনীপুরে একটা অধ্যাপনার কাজ পেয়েছিলাম, আর রুমা বি.এ. পাশ করে একটা কেরানীগিরি। রুমা আর আমি ঘোরাঘুরি করে একটা জমিও কিনে ফেলেছিলাম গড়িয়ার কাছে। রুমার টাকায়। আমি যখন কলকাতায় আসতাম তখন রুমাদের বাড়িতে যেতাম। রুমা তার জ্যাঠতুতো ভাইবোনদের সঙ্গে বনয়ে বানিয়ে একঘরে পাঁচজন দিব্যি থাকত। আমার মা প্রথম প্রথম রুমার খুঁতের জন্য আপত্তি করলেও, পরে আর বিশেষ কিছু বলতেন না। কারণ রুমা তাঁকে একদিন তার পুঁজির খানিকটা আন্দাজ বোধহয় দিয়ে থাকবে। বরং মাকে একদিন বলতে শুনেছিলাম রুমার ত আর জন্ম খুঁত নয়। গালের দাগ বা পায়ের দোষ ত এ্যাকসিডেণ্টের জন্য। ছেলেপুলে হলে তারা ত আর ওই ডিফেক্ট পাবে না। আমি সব শুনতাম আর মনে মনে হাসতাম। লোকে ভাবত আমাদের বড় গাঢ় ভালোবাসা। শুধু আমরা দুজনে আসল ব্যাপারটা জানতাম।

আমাদের দুজনের মধ্যে কেবল হিসেব আছে, মাপ আছে, অজস্র সাংসারিক আর বৈষয়িক ভবিষ্যতের অংক কষা আছে। কিন্তু একেবারেই প্রেম নেই। এমন কি রুমা আর আমি শখ করে মাঝে মাঝে রেস্তোরাঁয় খেতেও যেতাম। পার্কে টার্কে বেড়াতেও যেতাম। আমরা যুবক ও যুবতী। শরীরের দুটি বিকৃতি ছাড়া রুমা ত মোটামুটি সুন্দরীই ছিল। দিন দিন আরো সুন্দরীও হচ্ছিল। পোশাকে আশাকে বেশ কেমন একটা বাঙালী আটপৌরে ধরন চলে আসছিল রুমার মধ্যে। আমি লক্ষ্য করতাম, আমি ঠিক যেমনটি পছন্দ করি, রুমা ঠিক তেমনটিই হতে চায়। তাঁতের শাড়ি, কপালে চন্দনের টিপ লম্বা বিনুনী কিংবা এলো খোঁপা। আমি বুঝতেই পারতাম এসবই রুমা ভালোবাসায় করে না। করে আতঙ্কে। ওর বাবা আর মিলির

কঠোর বিশ্বাসঘাতকতায়, কমল খান্নার তাচ্ছিল্যে, ওর মায়ের ভয়ঙ্কর মৃত্যুতে, এ্যাকসিডেন্টে, রুমা বড় অসহায় হয়ে গিয়েছে। ও আমাকে হারাতে চায় না আর। আর আমি। সূর্য রায়। আমিও নিজেকে একটা মাপের মধ্যে ভরে নিয়েছিলাম। আমি জানতাম আমাকে বিয়ে করতে হবে রুমাকেই। রুমার জমির ওপর একটা বাড়ি বানাতে হবে আমাদের দুজনের কৃপণতা করে জমানো পয়সায়। তারপর শেষ বয়সে আরামে থাকা একটু বা ঘোরা, বেড়ানো, হাসপাতালের খরচ, মরার পর শেষকৃত্য এসবের জন্য ব্যাংকে কিছু টাকা এবং হবু একটি কি দুটি সন্তানের জন্য কিছু সম্পদ রেখে যেতে হবে। এই মাত্র।

এইভাবে যখন জীবনটাকে ভাবতে শুরু করে পুরোনো ছটফটানি থেকে রেহাই পাচ্ছি ঠিক সেই সময়ে অলকার সঙ্গে আমার তৃতীয়বার দেখা হয়ে গিয়েছিল।

দেখা হয়েছিল, কোণারকে।

আমার কলেজ লাইফের ওড়িয়া বন্ধু সৌভাগ্যকুমার মিশ্রের নিমন্ত্রণে কটক গিয়েছিলাম। কটকে কিছুদিন কাটিয়ে তারপর পুরীতে। পুরী থেকে চলে যাই কোণারকে। সৌভাগ্য ছিল কবি। ও কোণারক নিয়ে অনেক গভীর কথা বলত। ও পরামর্শ দিয়েছিল কণ্ডাক্টেড্ ট্যুরে কোণারক না দেখে কোণারক যাওয়া উচিত বেশ খানিকটা সময় হাতে নিয়ে। সৌভাগ্যই ওখানকার রেস্টহাউসে আমাদের জন্য সব রকম ব্যবস্থা করে রেখেছিল। সুতরাং পুরী থেকে কোণারকে এসে আমি পুরো একদিন ঘুরে ঘুরে মন্দির আর তার আশপাশ দেখে বেড়িয়ে সন্ধ্যায় ফিরে এসেছিলাম আস্তানায়।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে কোণারকের মন্দির দেখেছি। ভালো খাওয়া দাওয়াও হয়েছে। মন্দিরের খুব কাছেই রেস্টহাউস, সারাদিনের আনন্দময় ক্লান্তির পর রেস্টহাউসের বারান্দায় বেতের আরাম কেদারায়

বসে অর্ধনীমিলিত চোখে সিগারেট ধরিয়েছিলাম। আমার মনের মধ্যে বারবার ভেসে উঠছিল কোণারকের মন্দিরের প্রাচীন পাথুরে প্রস্থটা। মনে পড়ছিল মন্দিরের উঁচু চূড়ার কাছাকাছি সাজানো অতিকায় সুরসুন্দরীদের মূর্তিগুলোর চেহারা। সেখান থেকে অনেক নীচে, ঘোর লাল গেরুয়া মাটির ওপর ঘুরে বেড়ানো রঙীন মৌসুমী ফুল হয়ে ফুটে থাকা দর্শনার্থীদের ছবিও ফুটে উঠছিল চোখের সামনে।

হঠাৎ রাস্তা ঘুরে সোজা রেস্টহাউসের সামনে গর্জন করতে করতে এসে থামল একটা স্টেশন ওয়াগন। ড্রাইভার দরজা খুলতেই ভিতর থেকে জীনস্ আর শার্ট পরে নামল একটি ছিপছিপে মেয়ে। হাতে তার মহার্ঘ শ্যামোয় লেদারের তৈরী একটি ছড়ানো টুপি। টুপির ওপর পালকের তৈরী গোলাপগুচ্ছ—দেখেই চিনলাম মেয়েটিকে। সকালের দর্শনার্থীদের মধ্যে মেয়েটি ছিল। আমি অনেক উঁচু থেকে দেখেছিলাম। সবচেয়ে দামী আর রঙচঙে সাইট-সিআরদের মধ্যে মেয়েটি ছিল।

মেয়েটি গাড়ি থেকে নেমে রেস্টহাউসের কেয়ারটেকার লোকটিকে একটা চিরকুট দেখাতেই, সে শশব্যস্ত হয়ে একটি বড় ঘর খুলে দিল। আলো জ্বালা হল। বোধহয় ডিনারের কথাও জিজ্ঞেস করে থাকবে লোকটি। মেয়েটি মাথা নেড়ে জানাল তার কিছুই চাই না। ড্রাইভার মহার্ঘ দুচারটি ব্যাগ আর কেস বয়ে আনল ভিতরে। তারপর মেম-সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের থাকার ব্যবস্থা করতে গেল। আমার অন্ধকার আর শান্তি বেশি বিঘ্নিত হল না। কারণ মেয়েটি বোধ হয় খুব ক্লান্ত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দিল।

রাতে ডিনারের পর, আলস্য ভরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বুকে বালিশ দিয়ে রুমাকে ছোট্ট একটা চিঠি লিখলাম। তার বক্তব্য হল ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম কিউমিলেটিভ ডিপোজিটের টাকা দেওয়ার হিসেবপত্তর আর গড়িয়ার জমিতে বাড়ি করার নকসা পছন্দ করার বিষয় একটি সারগর্ভ মতামত। তারপর পরম পরিতৃপ্তিতে আলো

নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় এসে চুপচাপ শুতেই আমার কিন্তু সারা শরীর কেমন শিরশির করে উঠল।

সে সময়টা ছিল শরৎকালের প্রথম দিক। একটা প্রথম শিশির-পাত, ভৌতিক চাঁদের আলো ঢালা মন খারাপ করা সময়।

আমি ঘুমের দিকে চলে যেতে যেতে ভাবলাম আমার কত কাছে কোনারকের ওই বিশাল কালজয়ী পরিত্যক্ত মন্দির। আর তার সেই অস্তিত্বের তুলনায় নেহাতই অকিঞ্চিতকর—ওই কোণারকের রাস্তার দু পাশের সার সার ভাতের হোটেল আর এই রেস্টহাউসের বিলিতি কেতার বাড়ি। বাইরের জানলা দিয়ে ভূতগ্রস্ত জ্যোৎস্নার ঢল গ্রিল কেটে-কেটে ঘরের ভিতর নেমেছে। আধো ঘুমের মধ্যে কেবল মাত্র ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। রাত্রি যেন লম্বা লম্বা দাড়া মেলে একটা ভেলভেটের চিরুনীর মতো আমার শরীরটার ওপর শুঁয়ো বোলাচ্ছিল।

আর সেই কালো কালো গরাদের ভিতর দিয়ে ফুটে ফুটে বেরিয়ে আসছিল সারাদিন ধরে দেখা মন্দিরের লোভী যক্ষের বিরাট মুণ্ড, ড্রাগন সদৃশ অজানা পাথুরে জানোয়ার, জলজ-লতার জালের ভিতর থেকে প্যানেলে ক্ষোদিত করা বিভিন্ন নর্মদৃশ্য, আমার ভিতরে যেন ঘুরে ঘুরে উঠছিল সূর্যমন্দিরের সেই বড় বড় অনড় চাকাগুলো। আমি যেন সেই আশ্চর্য চলন্ত রথে চড়ে ঘুমের মধ্যে দিয়ে, বহুদূর—বহুদূর ভেসে গিয়েছিলাম।

সকালে উঠে দরজা খুলে বেরিয়েই অলকার মুখোমুখি হলাম।

—আরে, সূর্য!

সত্যিই ত, আমার ত আগেই বোঝা উচিত ছিল এ মেয়ে অলকা। না হলে একটি মেয়ে, একা একা এমন চট করে একজন ড্রাইভার মাত্র সম্বল করে চলে আসতে পারে? এতদূরে?

আমাকে দেখে আমার দিকে দু হাত বাড়িয়ে আমার হাত দুটি ধরে অলকা বলল,

—সূর্য! কতদিন পরে?

আমি সহাস্যে মাথা নাড়লাম।

অলকা কেমন রোগা ছিপছিপে অথচ তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে। কবছর আগের সেই কাঁচা স্নিগ্ধতা আর সৌকুমার্য যা তার সারা শরীরে তীব্র বুদ্ধি আর প্রতিভার সঙ্গে মাখানো থাকত, কোমরের চামড়ায়, বাহুমূলে, নরম তুলতুলে একটু আধটু বাড়তি চর্বির খাঁজে, রূপ লাবণ্যের বাড়াবাড়ি, তা সব যেন স্টীলের মতো কঠিন হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ আর ঢালাই হয়ে গেছে।

সত্যি কথা বলতে কি অলকা আরও সুন্দর আর মূল্যবান হয়ে গেছে। অলকা একটা কালো দাবার ছকের মত ছাপ তোলা লাল কালো আর শাদা মেশানো কট্‌কি শাড়ি পরে ছিল। শাড়িটি রীতিমতো মূল্যবান। আমি এর দাম জেনেছিলাম কটকে। রুমার জন্য ওই ধরনের একটি শাড়ি কিনতে গিয়ে দাম শুনে পেছিয়ে এসেছিলাম কদিন আগে।

আমি আর রুমা, আমাদের পোশাক আশাক কাপড় চোপড় কত টাকার মধ্যে হবে তাও ঠিকঠাক করে রেখেছিলাম। উচ্ছ্বাস কিংবা সমঝদারীতার খাতিরেও আমরা কখনো মাত্রা ছাড়াতাম না। অলকা তার হাতের দামী হ্যাণ্ড্‌ ব্যাগ থেকে কালো চশমা বের করে চোখে লাগাতে লাগাতে বলল,

—মন্দিরে যাবে না?

—এত সকালে?

হাতের টুপিটা মাথায় পরে অলকা বলল,

—আমার যে আশ মিটছে না সূর্য!

—কিসের আশ্‌?

অলকা আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল,

—বিশ্বাস কর, কোণারক আমাকে টানছে। আমি ত কাল বিকেলে আমার দলের সঙ্গে পুরী রওনা হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কি যে ভূত মাথায় চাপল, আবার যাত্রা ভঙ্গ করলাম। ফিরে আসতে হল

আমাকে। আমি জানি না, আমি সত্যই জানি না সূর্য, আজ সারাদিনেও···কাল···পরশু···সূর্য, আমি জানি না কবে কোণারকের ওই আশ্চর্য মন্দির দেখে দেখে আমার সাধ মিটবে।

আমি অলকার সেই উজ্জ্বল সবুজ আভার আগুন জ্বালা চোখের তারার চঞ্চলতার দিকে তাকিয়েই রইলাম। তার ভিতর একটা তীব্র আবিষ্টতা জ্বরের ঘোরের মতো থর থর করে কাঁপছে।

অলকা বলল,

—কি তৈরী হয়ে নাও, তুমি মন্দির দেখতে যাবে না?

আমি হেসে বললাম,

—নাঃ, আমার কাল দেখা হয়ে গেছে। আজ আমি চলে যাচ্ছি!

অলকা আবার আমার হাত দুটো ধরে বলল,

—না, প্লিজ্, আজকের দিনটা থাকো! কাল আমি যদি ফিরি আমার সঙ্গে ফিরবে, আর যদি আমার ফিরতে না ইচ্ছে করে আমার ড্রাইভার তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

আমি মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলাম না। এই অলকাকে বলা যায় না যে লাইনে দাঁড়িয়ে থার্ড ক্লাশের টিকিট আমি কেটে রেখেছি। কালই কলকাতায় রওনা। সে টিকিটের ক্যানসেলেসন হওয়া মানে আমার আর রুমার আর্থিক হিসেবে একটা বিরাট গরমিল হয়ে যাওয়া। অলকা কথা বলে আর দাঁড়াল না। বারান্দা পেরিয়ে নেমে গেল। সেখান থেকেই আবার বলল,

—তাড়াতাড়ি করো। মন্দিরে চলে এসো! হ্যাভ্ এ কুইক শেভ্ এ্যাণ্ড বাথ্!

ভোরের হাওয়ায় আমার গেঞ্জী মোজা শরীর শিরশির করে উঠল। আমার মনের ভিতর নিজের অজান্তেই উৎসবের ঘণ্টা বেজে উঠতে লাগল।

দাড়ি কামিয়ে, চা খেয়ে, স্নানটান সেরে, ধুতি পাঞ্জাবি চড়িয়ে বেরিয়ে এলাম।

সকালের আলোর সঙ্গে আকাশে মাথা তোলা রহস্য মন্দির কোণারকের যেন কোনো যোগাযোগ নেই।

ভিতরের চত্বরে তখনও ট্যুরিস্ট কিংবা দর্শনার্থীদের ভিড় বাড়ে নি। দু'চারজনের খাপছাড়া দল ঘুরে বেড়াচ্ছিল এদিকে ওদিকে। আর তাদের মাঝখান দিয়ে যেন একটা স্বপ্নের বুদ্‌বুদের মতো হাল্কাভাবে ভেসে বেড়াচ্ছিল অলকা। আমি মস্ত লম্বা প্রাচীরের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে মন্দিরের প্রধান গেট দিয়ে ঢুকে অলকার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

অলকা হাতের তালুর মতো সরু লম্বা একটি পাথরের প্যানেলের গায়ে খোদাই করা সারি সারি নৃত্য-প্রতিমা দেখিয়ে বলল,

—সূর্য, একটা মজা দেখবে ? ডানদিক থেকে বাঁ দিকে চোখের দৃষ্টিটা পর পর প্রত্যেকটা মূর্তি দেখতে দেখতে নিয়ে যাও—

আমি অলকার কথামতো সেই কলংকধরা, প্রকৃতির নখের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত দেওয়াল-পরীদের নৃত্যভঙ্গির ওপর দিয়ে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে চোখ নিয়ে গেলাম। আর আমার চোখের সামনে ক্রমশ ফুটে উঠতে থাকল একটি রমণী শরীরে ক্রমশ হিল্লোলিত হয়ে উঠতে থাকা একটি সম্পূর্ণ ওড়িশি নাচের মুদ্রাভঙ্গি। অথচ কালকেও এই প্যানেলের কাছ দিয়ে বার কতক ঘোরাফেরা করে গেছি। চোখেও পড়ে নি প্যানেলটা। কিংবা চোখে পড়লেও ঠিক এমন করে যে দেখতে হয়, তা ত আমি জানতাম না। এ মন্দিরের বহু বছরের প্রাচীন রহস্য-সংকেতের চাবিকাঠি যার হাতে, তেমন গাইডও এর আগে পাইনি আমি।

অলকা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল,

—জানো সূর্য, এ মন্দিরে কোনোদিন পুজো হয় নি !

আমি অবাক হয়ে তাকালাম অলকার দিকে,

—কেন ?

অলকা কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে মন্দিরের দিকে তাকিয়েছিল।

আমি অলকার দৃষ্টি অনুসরণ করে মন্দিরের দিকে তাকালাম।

দূরে সমতল থেকে একটু নীচে মন্দির। অলকা আঙুল বাড়িয়ে বলল,

—দেখ, ওই সামনের ছোট মন্দির, তারপর মাঝারি,…

আমি অবাক হয়ে বললাম,

—মাঝারি বলছ কেন্?

অলকা হেসে বলল,

—আমার কাছে পুরো মন্দিরের একটা ছবি আছে, তোমায় দেখাবো। যে মন্দিরটা এখন দেখছ ওটার পরেও একটা অনেক উঁচু ডোমের মতো সূর্য-দেবতার আসল গর্ভ মন্দির ছিল। সেটার একটা ভাঙা অংশ একজন ব্রিটিশ পেন্টারের আঁকা ছবিতে খাড়া দেখেছি। বোধহয় শ' দুই আড়াই বছর আগের একটা দারুণ ঝড়ে সেটাও ধূলিসাৎ হয়।

আমি অলকার মুখের দিকে তাকিয়ে আসল ঘটনাটা কি আবিষ্কার করতে চাইলাম। অলকার চোখের সবুজাভ তারা দুটি কি অদ্ভুত একটা আনন্দে জ্বলছে।

আমি বললাম,

—তুমি যে একেবারে রিসার্চ ওয়ার্কারের মতো কথা বলছ।

—তাই-ই ত বলছি। পুরীতে এসেই আমি বই যোগাড় করেছি। কোণারক সম্বন্ধে যেখানে যা পেয়েছি পাঁতি পাঁতি করে পড়েছি। আসল কোণারক ছিল পুরীর মন্দিরের মতো তিনটি মন্দির মিলিয়ে একটি,

আমি হেসে বলেছিলাম,

—তারপর?

—তারপর?—শুনেছি একটা মস্ত ভারী চুম্বকে গর্ভ-মন্দিরের পাথরের ভারসাম্য ধরা ছিল। সমুদ্রগামী জাহাজের সব লোহা নাকি টেনে নিত সেই অতিকায় চুম্বক। একবার একটা পর্তুগীজ জাহাজকে ওই ভাবে ডুবিয়ে দেয় চুম্বকটি। তারপর ক্রোধান্বিত পর্তুগীজরা নাকি অন্য যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে এসে কামানের গোলার ঘায়ে স্থানচ্যুত করে

দেয় চুম্বকটাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে খসে ঝরে পড়ে সেই গর্ভ-মন্দিরের একটা অংশ।

আমি অলকার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে সেই চৌবাচ্চার মতো ভাঙাচোরা গর্ভ-মন্দিরের পিছন দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আস্তে আস্তে মন্দিরের থাক বেয়ে বেয়ে উঠতে লাগলাম।

অলকা হেসে বলল,

—কৈ সূর্য কিছু বললে না?

আমি বললাম,

—কি বলব?

—কেন? তারপর?

অলকা বলল,

—বিশ্বাস হয়, তারপর এই পুরো মন্দিরটার চূড়া পর্যন্ত ঢেকে গিয়েছিল স্তূপীকৃত বালিতে। চূড়োর চক্র দেখে খুঁড়ে খুঁড়ে মন্দির আবার বালির তলা থেকে বের করা হয়েছে। 'অর্ক' মানে জানো? ওই মন্দির সূর্যের রথ। দেখছ না সূর্যের সব ঘোড়া। সাতটা ঘোড়ার কতগুলো ভেঙে খসে গেছে। দেখছ, কি বড় বড় চক্রের ওপর দাঁড়িয়ে আছে রথটা।

সূর্য তুমি সূর্যকে দেখেছ? সূর্য দেবতাকে? এসো, দেখবে এসো,

অলকা আমার হাত ধরে জোর টান দিল। ঘুরে ঘুরে মন্দিরের গা ভেঙে ভেঙে বের করা অসমান আর সংকীর্ণ সব ধাপ বেয়ে উঠতে লাগলাম আমি। আমার হাত দৃঢ় মুঠোয় চেপে ধরে অলকা বলল,

—এই জানো সূর্য, তুমি আছো বলে আজ আমার উঠতে খুব সুবিধে হচ্ছে।

আমি বললাম,

—কেন,

—আমার ভার্টিগো আছে, নীচের দিকে তাকালে আমার মাথা ঘোরে।

একটি মোড় ঘুরতেই আমাদের সামনে ফুটে উঠল কালো কষ্টি পাথরে গড়া অসাধারণ রূপবান সূর্যদেবতার সেই পরুষ মূর্তি।

—সূর্য, এই দেখ, ইনিই এই মন্দিরের উদ্বাস্তু দেবতা সূর্য।

বহুবার দেখা সেই মূর্তিটিকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখতে লাগল। সত্যিই দেখবার মতো মূর্তি। এর আগে বহুবার এই সূর্যদেবতার ছবি দেখেছিলাম। কিন্তু ছবিতে আর কতটুকুই বা ধরা যায়।

অলকার নিষ্ঠা দেখে আমি কেমন যেন বুঝতে পারলাম অলকা আর পাঁচজন দর্শনার্থীর মতো কোণারক দেখতে আসে নি। আসবে, দেখবে, চলে যাবে, পাঁচটা সাইট সিইঙ-এর সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে মনের ভিতরে রেখে দেবে, এমন সামান্য ইচ্ছে অলকার নেই।

আমি চুপচাপ সেই বাদলের মেঘ ঘন দুপুরে, চাপা রদ্দুরের আভা লাগা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে অলকাকে দেখতে লাগলাম। তার মাথায় রোদ বাঁচানো টুপি। একটি হাত আমার হাতে ধরা। গা থেকে পপি ফুলের ঘুম মাখানো ঘাম ঘাম গন্ধ।

—এই সূর্যদেবতাকে ওই ভাঙা গর্ভ-মন্দির থেকে উদ্ধার করে এখানে এনে রাখা হয়েছে। কি সুন্দর সূক্ষ্ম কাজ দেখেছ! আহা মনে হয় যেন এখুনি চোখের পাতা কেঁপে উঠবে, নাকের পাতা ফুলে উঠবে, ঠোঁট কাঁপিয়ে উনি আমায় বলবেন,

—এসেছ,

সত্যি কি সূক্ষ্ম কাজ। অলংকার, চুলের রেখা, এমন কি পাতলা কাপড়ের ভাঁজের ঢেউগুলো অবধি।

আমরা মুগ্ধ হয়ে কত যুগ আগের তৈরী সেই অসাধারণ পুরুষ মূর্তিকে দেখছি, এমন সময় সিপ্‌সিপ্‌ করে বৃষ্টি এল। ওপর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম নীচে দর্শনার্থীরা ছুটে গাছতলায়, মন্দিরের খাঁজে খোপে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। রক্তের রঙের মাটি থেকে, রক্তের রঙের জলধারা ক্রমাগত গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে লাগল। আমি আর অলকা ভাঙা মন্দিরের, মাথা খোলা, সঙ্কীর্ণ চৌকো একটি খোপের মধ্যে

সূর্য দেবতার দুপাশে দাঁড়ালাম। তাঁর মাথার ওপর যে অল্প পাথরের খিলান-ছাউনি ছিল তার তলায় অতটুকু ছাউনিতে মাথা বাঁচলেও দেহ বাঁচে না। আমরা দুটি জীবন্ত মানুষ, নিঃশ্বাসে আবেগে আমাদের বুক প্রাণস্পন্দনে ধুক্‌পুক্‌ করছে, আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে অপূজিত এক সুন্দর পাথর।

অলকা বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলল,

—কি সূর্য, কথা বলছ না যে!

আমি বললাম,

—অলকা, আসল ব্যাপারটা কি বল ত?

অলকা হাসল,

—জানো, কেবল এই সূর্য-মন্দির দেখবার জন্য আমি আমার টাইট্ শিডিউল্ ছেড়ে সেই দূর বম্বে থেকে এসেছি। শুধু এই সূর্যমন্দিরের টানে।

আমি অবাক হয়ে বললাম,

—সে কী?

—হ্যাঁ, বিশ্বাস কর। আমার যে কি হল! একদল হিপি এসেছিল কোণারক দেখতে। ওদের সঙ্গে আমার দেখা হয় গোয়ার সি-বিচে। ওরা যে কি অদ্ভুত ইমোশন নিয়ে কোণারকের কথা বলছিল। তারপর আমি কোণারক সম্বন্ধে ছোট্ট একটা হ্যাণ্ড্‌বুকও পড়ি।

কিন্তু সত্যিকারের কোণারক যে কত আলাদা। ভাবাই যায় না।

—আচ্ছা অলকা, তোমার এই টুপি দেখেই বলছি, তুমি ত কাল কোণারকে এসেছিলে। ঘুরছিলে, আমি দেখেছি। তোমার সঙ্গে অনেক অবাঙালী স্ত্রী-পুরুষও দেখেছিলাম। তারাই বা কোথায় গেল?

—একদল মহারাষ্ট্রীয়ান বন্ধু-বান্ধব ট্যুরে বেরিয়েছিলেন। ওঁদের সঙ্গেই চলে এসেছিলাম। ওঁরা পুরী-ভুবনেশ্বর, কোণারক, চিল্কা সব দেখবেন, গোপালপুরে কিছুদিন বিশ্রাম করবেন, তারপর ফিরবেন।

আমি আর কোথাও যাব না। আর ঘুরব না। সোজা ফিরে যাবো বম্বে। ভুবনেশ্বর থেকে প্লেনে চলে যাবো।

—তুমি বম্বেতে থাকো এখন ?

—হ্যাঁ, পাকাপাকি থাকি। ওখানেই আমার পাব্‌লিসিটি ফার্ম খুলেছি। আমিই সর্বেসর্বা। নো চৌধুরী বিজনেস্‌!

আমি হেসে বললাম,

—শেষ পর্যন্ত চৌধুরীকে ছাড়তে পারলে ?

—চৌধুরী এখন সতী হয়ে গেছে। মানে বুড়ো হলে লোকে যা হয়। বউ-এর কাছে ফিরে গেছে, যাতে অল্প বয়সী মেয়েদের কাছে নিজের অপৌরুষ নিয়ে লজ্জায় পড়তে না হয়। আমার মোটা টাকা জমে গিয়েছিল, ভালো বিজনেস্‌ কনেকসন্‌ হয়েছিল, তাই নিয়ে দিব্যি বম্বে ভেসে পড়লাম। এখন আমার দারুণ ব্যবসা। ফিল্মের জন্যেও ভয়েস দিচ্ছি। ডক্যুমেনটারিতে, কমার্শিয়াল 'শর্টে'। রেগুলার। আমার ভাই বোনরাও ওয়েল প্লেসড্‌, ওয়েল এজুকেটেড্‌। কলকাতার মস্ত ফ্ল্যাট সিস্টেমে বাড়ি করে দিয়েছি, যাতে ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়েও বাবা মার চলে যায়। তাছাড়া একটা ছোট বোটিক্‌ খুলে দিয়েছি আমার ছোট দুজন বোনের জন্যে। সেখানে ছাপা শাড়ী আর ভারতের নানান জায়গা থেকে আনা দুষ্প্রাপ্য সব ড্রেস-মেটরিয়াল বিক্রি হয়।

বাস্তব ভেঙে আবার স্বপ্নের মধ্যে চলে গেল অলকা।

এই ভাঙা মন্দিরের ওই সবচেয়ে উঁচু চূড়ায় আমার দারুণ উঠতে ইচ্ছে করছে সূর্য, খুব কাছে থেকে দেখতে ইচ্ছে করছে। সুর-সুন্দরীদের।

—কিন্তু তোমার যে ভার্টিগো আছে।

—হ্যাঁ, অনেক উঁচুতে উঠলে আমার কি রকম যেন ভয় করে মাথা ঘোরে, নীচে লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে,—তবু সূর্য আমার যে অনেক অনেক উঁচুতেও উঠতে ইচ্ছে করে!

আমি আর অলকা ভাঙা মন্দিরের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে এখনো যে

মন্দিরটি অবশিষ্ট আছে, উচ্চতায় যদিও দ্বিতীয়, ভিতরে ঢোকা যায় না। লর্ড কার্জন নাকি সংস্কার করে মন্দিরটির বাইরেটা যাতে ভেঙে না পড়ে সে জন্য ভিতরে পাথর ঠেসে ভরে সব দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়েছেন। আমরা সেই মন্দিরের ওপর উঠলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি সুর-সুন্দরীরা।

তারা তাদের সেই তারকাহীন পাথরের চোখ আঁকা মুখ, বড় বড় খোঁপা, ভারী ভারী অবাস্তব স্তন, উরু, ক্ষীণকটি…সারা শরীরে প্রকৃতির আসঙ্গের ক্ষয় আর পালিশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বছরের পর বছর শতাব্দীর পর শতাব্দী এই সুরসুন্দরীরা কোণারকের দেউল ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। কত যুগ আগের কোন ওড়িতি সুন্দরীর মূর্তিকে আদর্শ করে এই অতুলনীয় সব মোহিনী মূর্তি তৈরী হয়েছিল। স্বর্গপুরীর দেবদেবীদের কাছাকাছি এইসব অলকা পুরীর নৃত্যপটিয়সীরা মনে হয় আজও তাদের নাচ ভোলে নি। আজও, যে কোন মুহূর্তে তাদের পাথুরে শরীর দুলে উঠতে পারে। খসে পড়তে পারে প্রকৃতির ক্ষয়, প্রকৃতির শ্যাওলার ছাপ। অলকা তাদের একজনের উরুতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার হাত চেপে ধরে বলল,

—সূর্য আমরা কি স্বর্গে চলে এসেছি!

আমি পাতলা একটু হাসলাম। ওপরে আকাশ আবার নীল হয়ে আসছে। মন্দিরের ঢালু কিনারাগুলো পিছল। অপার্থিব পাথুরে নারীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি অলকার কথা শুনছি,

—জানো সূর্য একটি ছোট্ট ছেলে ছিল। সে তার বাবাকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। বাবাকে সে দেখে নি। মায়ের কাছ থেকে শুনেছে তার বাবা নাকি চন্দ্রভাগা নদীর তীরে মস্ত এক মন্দির গড়ছে। খুঁজতে খুঁজতে একদিন বাবার কাছে এসে হাজির হল ছেলেটি। বাবার সঙ্গে দেখাও হল তার। যে সব শিল্পীরা মন্দির বানাচ্ছিল তারা নাকি বসাতে পারছিল না একটা বিশাল চুম্বককে। শিল্পীর সেই ছোট ছেলেটি সব কুশলী শিল্পীকে হারিয়ে সেই চুম্বকটি ঠিকঠাক লাগিয়ে

দেয়। সমস্ত বড় মন্দিরটা, যেটা এখন আর নেই, সম্পুর্ণ ধ্বসে পড়েছে তার পাথরের সব ভারসাম্য নাকি ছিল ওই চুম্বকে। স্ফটিকের কৌটোর প্রাণভোমরার মতো। ছেলেটির কৃতিত্বে শিল্পীদের মধ্যে শুরু হল দারুণ অসন্তোষ। রাজা যদি একবার জানতে পারেন যে একটি ছোট ছেলে যা পেরেছে, বড় বড় শিল্পীরা তা পারে নি, তাহলে কি হবে? তাই শুনে শিল্পী পিতার খোঁজে আসা সেই ছোট ছেলেটি দারুণ অভিমানে চন্দ্রভাগা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।

আমি হেসে বললাম,

—অলকা, বোধহয় তা নয়, হয়ত ছেলেটির তোমারই মতো ভার্টিগো ছিল।

অলকা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অঝোরে বৃষ্টি পড়ছিল। আমরা দুজনে রীতিমতো ভিজে গিয়েছিলাম। অলকা হঠাৎ চাপা গলায় বলল,

—হয়, এমন খুব হয়। বড়দের প্রতি দারুণ ক্ষোভে অভিমানে ছোটরা আত্মবলি দেয়,

অলকা বলল,

—জানো সূর্য, কোণারক বড় দুঃখী মন্দির।

—কেন? দুঃখী কেন?

—পৃথিবীর একটা অন্যতম সেরা মন্দির, অথচ একটা দিনও এখানে পুজো হল না। একটা নিষ্পাপ বালকের রক্তপাতে প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগেই অপবিত্র হয়ে গেল।

আমি জানি না অলকা সেদিন কেঁদেছিল কিনা। কারণ তার মুখ ভরে ছিল আকাশে কান্নায়। বৃষ্টির অবিরল ধারায়।

বৃষ্টি আর ধরল না।

সেই পিছল পাথরের গা বেয়ে অলকাকে ধরে ধরে নামিয়ে আনতে আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। ওঠা সোজা। তখন চোখ থাকে ওপর দিকে। আকাশের গায়ে। কিন্তু নামার সময় বার বার নীচের দিকে

তাকাতে হয়। আর মাথা ঘোরার স্নায়বিক রোগ যাদের আছে, তাদের মাথা আরো পাক খেতে থাকে।

অলকা আর আমি বেলা বারোটা নাগাদ রেস্ট হাউসে ফিরে এলাম। স্নান খাওয়া করে আমিই অলকাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

—কি, এখন ত ঝকঝকে রোদ, আর একবার মন্দিরে যাবে নাকি ?

অলকা কেমন অদ্ভুত করে আমার দিকে তাকাল। তার চোখ নিমীলিত। আমি লক্ষ্য করলাম অলকার পরনে ঘোর লাল রঙের একটা পা পর্যন্ত লুটোনো ফ্রিল দেওয়া গাউন। কাঁধে লুটোচ্ছে তার খোলা এলো চুল। কাছে এসে যখন কথা বলল অলকা তখন তার মুখে আমি স্পিরিটের গন্ধ পেলাম। বলল,

—নাঃ এখন আর যাব না। এখন ঘুমোব। রাতে যাবে সূর্য। মন্দিরে। রাতে। আজ পূর্ণিমা। জানো তো আজ দারুণ, দারুণ জ্যোৎস্না হবে!

—রাতে ? রাতে মন্দিরে যাবে ?

—হ্যাঁ জানো না ? রাতে নাকি ওই পোড়ো মন্দিরে অদ্ভুত বাঁশি বাজে। অদ্ভুত বাঁশি। আমি যেন স্বপ্নে দেখতে পাই ওই সুর-সুন্দরীরা অন্ধকারে, জ্যোৎস্নার আলোয় আবছায় নড়ে চড়ে ওঠে, ঢোলক বাজায়, খঞ্জনী বাজায় আর বাঁশি। কিন্তু না সূর্য, আমি তোমায় নিয়ে যাব না। আমি একা যাব।

—কেন ? হঠাৎ আমাকে বাদই বা কেন ?

—না সূর্য সে বাঁশি নাকি যে শোনে সে আর বাঁচে না।

আমি হেসে উঠলাম।

অলকা বলল,

—হাসছ কেন সূর্য ? এই ত সবে জীবন শুরু করতে যাচ্ছ। কত সাধ আহ্লাদ বাকি তোমার জীবনে। তুমি কেন রাতে কোণারকে যাবে সূর্য! আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, অলকা আমার কথার

কোনো উত্তর না দিয়ে ঘুরে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। তারপর সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

আমি ঘরে ফিরে এসে বিছানায় এলিয়ে পড়ে একটা দারুণ ঘুম দিলাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা চলে গেছে। একটা সুখাবহ তন্দ্রার মধ্যে খানিকক্ষণ কাটল। খানিকক্ষণ বাদে গাড়ি পার্ক করার শব্দ হল। ভাবলাম অলকা বোধহয় চলে যাচ্ছে। আমি ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে দিলাম। দেখলাম বাইরে অলকার স্টীলরঙা স্টেশনওয়াগনটা দাঁড়িয়ে। আর তার পাশে ড্রাইভার। আমাকে দেখে ড্রাইভার সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম,

—কি তোমার মেমসাহেব চলে যাচ্ছেন ?

ড্রাইভার বলল,

—না হুজুর মেমসাহেব রেস্টহাউসেই নেই। এরা বলছে মন্দিরে গেছেন। সেই দুপুরে, এখনও নাকি ফেরেন নি।

—সে কী ?

—মেমসাহেব এসে যাবেন। আপনি কিছু ভাববেন না। কাল কি আপনি চলে যাচ্ছেন সাব্ ?

আমি নিজের অজান্তেই বললাম,

—কে জানে ? ঠিক জানি না !

অথচ আমরা দুজনে কত হিসেব করে টিকিট কেটে রেখেছি। আমি আর রুমা। পুরীতে এসেই রিটার্ণ টিকিট কেটেছি এমন তারিখ মিলিয়ে, যাতে পৌঁছে অন্তত একটা দিনও বিশ্রাম পাই।

তাড়াতাড়ি পায়জামা গেঞ্জীর ওপর একটা শার্ট চড়িয়ে মন্দিরের দিকে চললাম।

আমাকে বেশিদূর যেতে হল না। দেখলাম অলকা আসছে। একটু আন্দোলিত দেহ। পরনে সেই জীন্‌স আর শার্ট, কাঁধে ফ্লাস্ক।

আমাকে দেখে হেসে আমার হাতে হাত রাখল অলকা! বলল,

—সূর্য, তবু ভরিল না চিত্ত! হয় না হয় না। কোণারক দেখে দেখে আর তৃপ্তি হচ্ছে না আমার। ইট ইজ এ হণ্টেড্ প্লেস সূর্য, আমাকে যে কিভাবে টানছে কোণারক।—আজ আমি চলে যাচ্ছি, আমি জানি আবার, আবার আমাকে বারবার ফিরে আসতে হবে।

আমরা দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে রেস্ট হাউসে ফিরে এলাম।

অলকার ড্রাইভার অলকাকে সেলাম করে তার হাতে কাগজে মোড়া একটা বোতল তুলে দিল। অলকা বোতলটা হাতে নিয়ে আমাকে বলল,

—সূর্য, কাল সকালেই আমি পুরী রওনা হয়ে যাচ্ছি। সুতরাং অদ্যই শেষ রজনী। এস না আমার ঘরে!

অলকার পিছন পিছন ওর ঘরে গেলাম। অলকা তার আগোছাল বিছানায় বসে পড়ল। আমি বসলাম ওর সামনে একটা ডেক-চেয়ারে। কাগজের মোড়কটা খুলে অলকা রামের কালোকোলো সুদৃশ্য বোতলটা বের করল। ও এত অভ্যস্ত এত সহজ! গ্লাসে ঢেলে জল মিশিয়ে আমাকে একটু দিয়ে ও নিজে খানিকটা গলায় ঢেলে ঢক্ ঢক্ করে গিলে ফেলে জল খেয়ে নিল একটু। তারপর বলল,

—সূর্য, ইয়ু ক্যান্ হ্যাভ্ হাফ্ দি বটল ইফ্ ইয়ু লাইক্, বাট নট মোর!

আমি আর একটু ঢেলে নিয়ে বললাম,

—ও, আই এ্যাম্ নট টেকিং এনি মোর—

—নাউ, প্লিজ গো, আমি এ্যাম্ ফিলিঙ্ ভেরি টায়ার্ড, অ্যাণ্ড্ ইফ্ ইয়ু ডোণ্ট্ মাইণ্ড্, প্লিজ ক্লোজ দ্য ডোর!

আমি গ্লাসটা হাতে নিয়ে বাইরে এসে অলকার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। বাইরে ঘোলাটে অন্ধকার। পূর্ণিমা রাত্রির চাঁদ মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছিল। ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে বাকি রামটুকু শেষ করে আমি বই পড়তে শুরু করলাম।

আমার রাতের খাবার ঘরেই খেয়ে নিলাম। শুনলাম অলকা রাতে নাকি কিছু খাবে না বলে শুয়ে পড়েছে।

কত রাত জানি না হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার। মনে হল আমার দরজায় কেউ আস্তে আস্তে নক্ করছে। কয়েকবার নক্ শোনবার পর উঠে দরজা খুলে দিলাম।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে সেই সন্ধ্যেবেলার অলকা। পোশাক আসাক কিছু বদলায় নি। সেই জীন্‌স আর শার্ট। ওই ভাবেই শুয়েছিল হয়ত। কাঁধে ঝুলছে একটা জ্যুট্ ব্যাগ আর জলের ফ্লাস্ক। পায়ে কাঠের স্লীপার। চাঁদের আলোর ঢল তেরছা হয়ে আমাদের ছুজনের কোমর পর্যন্ত চলে এসেছে। একেবারে বারান্দার গোড়া পর্যন্ত।

অলকা চাপা গলায় বলল,

— সূর্য, সমুদ্রে যাবে ?

—সমুদ্রে ? সমুদ্র কই ?

অলকা বলল,

—শুনেছি বহুদূরে ! মাইল ছু এক ত হবেই ! অনেকটা হাঁটতে হবে। কিন্তু শুনেছি, চমৎকার বিচ্। কেউ নাকি সে বিচে যায় না। দারুণ নির্জন···চলো না সূর্য ঘুরে আসি !

—এত রাত্রে ?

—হ্যাঁ। চলো। তোমার ত যাবার কথাই ছিল, ছিল না ? আমার সঙ্গে আজ রাতে, মন্দিরে ?

আমি কিছু বলতে পারলাম না। ছুজনের ঘর বন্ধ করে ছুটি চাবি পাপোষের তলায় লুকিয়ে রেখে অলকার সঙ্গে রওনা হয়ে গেলাম।

অলকা আমার হাত ধরে, একটুবা আমার দিকে ভর করে হাঁটছিল। রেস্ট হাউস পেরিয়ে প্রায় মাইল খানেক চলে এসেছি আমরা। পিছনে অনেক দূরে ফেলে এসেছি কোণারকের ভূতগ্রস্ত জ্যোৎস্নাস্নাত সূর্য-

মন্দির। আর অনেক কাছে চলে এসেছে আকাশ ভরা জ্যোৎস্না, বালিয়াড়ি। মাঝে মাঝে বনঝাউ গাছ। আর তাদের পায়ের তলায় ছোট ছোট ছায়া।

কখন পায়ের স্লীপার খুলে হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছি। অলকা ঝোলা থেকে বের করে নিয়েছে আধভরা রামের বোতল। বালিয়াড়ির ওপর যেমন তেমন করে বসে আমরা তুজনে একই বোতল থেকে কয়েক চুমুক করে রাম ঢালছি গলায়। এ একটা সুতীব্র অন্য নেশা।

আমি অলকার কথা জানি না। কিন্তু আমার নিজের মনে হচ্ছিল স্বাধীনতার স্বাদ হয়তো এই অবস্থারই কিছু কাছাকাছি। এক অদ্ভুত ভৌতিক পূর্ণিমার চাঁদ ঢালা জ্যোৎস্না। এমন তুধের মতো ঘন, এমন পাতলা কুয়াশা মেশা, যে গেলাশ ভরে ভরে পান করা যায়। এই পরিত্যক্ত বালিয়াড়ি। বালির ঢেউ খেলানো সমুদ্র। বালিয়াড়ির ঢেউ-এ ঢেউ-এ জ্যোৎস্নার আঁজলা আঁজলা আলোছায়া। সমুদ্রের হাওয়ায় ঝাউগাছ পাগলের মতো মাথা নাড়ছে। হাওয়া আসছে, তীব্র লোনা হাওয়া। আশেপাশে মাইলের পর মাইল জুড়ে কেউ কোথাও নেই। অলকা আর আমি হাতে হাত রেখে হেঁটে যাচ্ছি। কেমন একটা বন্ধুতার বলে পরস্পরের প্রতি তীব্র প্রীতির টানে মধ্য রাত্রি কি শেষ রাত্রে জানি না, একা।

আজও যখন আমার জীবনের সেই অদ্ভুত রাত্রির কথা ভাবি আমি নিঃশব্দে আমার সব কৃতজ্ঞতার ঝুলি অলকাকেই উজাড় করে দিই।

আমাকে মুক্তির স্বাদ অলকাই দিয়েছিল। প্রথম দিয়েছিল। আমরা সেদিন অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে অদ্ভুত সব দৃশ্যে চলে যাচ্ছিলাম। যে সব দৃশ্য আমাদের সত্যি সত্যি অবাস্তবের মতো বাস্তবের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

আমি অলকাকে যেন স্বাধীনতার মূর্তিমতী দেবীর মতো দেখছিলাম। সেই আশ্চর্য লিবার্টির দেবীর মতো সে যেন আমার জন্যে মুক্তির আলোকবর্তিকা তুলে ধরেছে।

অলকার পায়ের পাতা কেমন যেন অদ্ভুত টলমলে ছন্দে বালিয়াড়ির মতো ছোট ছোট গর্ত করছিল। সারি সারি গর্ত। অলকা আমার সামনে। ওর মনেই নেই যে ও আমাকে পিছনে ফেলে মাঝে মাঝে যেন গতির প্রবল বেগে এগিয়ে যাচ্ছিল। ওর পায়ে পায়ে তৈরী ছোট্ট ছোট্ট উপত্যকায় পা রাখতে রাখতে আমি চলেছিলাম। ঘামে অলকার পিঠের শার্টের পুরো কাপড়টাই ভিজে গেছে। মোটা হ্যাণ্ডলুমের অমসৃণ কাপড়। ওর সুন্দর আঁটো নিতম্বের দোলা ফুটে উঠছে সুছাঁদ জীন্‌সের মধ্যে দিয়ে। অলকার কাঁধ ছাপানো চুল থেকে খস্‌খসে শ্যাম্পু ধুলো আর ঘামের মিশ্র গন্ধ। ওর মুখের ময়লার আস্তর ছাপিয়ে রোমকূপের ভিতর থেকে উঠে আসছে, জানি না হয়ত ঘাম নয়, কেবল বিন্দু বিন্দু মধুময় তীক্ত কটু রামের বিন্দু।

অলকার কাঁধে ঝোলানো কারুকাজ করা জ্যুটব্যাগটা দুলছে। অনৈসর্গিক অলকার অদ্ভুত মুক্ত সেই হেঁটে যাওয়া, হেঁটে যাওয়া আর হেঁটে যাওয়া—অলকা মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে, কখনো বা নিজের মনে মনেই দু একটা কথা বলছিল কিংবা গানের দু একটা কলি।

সামনে দূরে কোথাও সমুদ্র আছে, সেখান থেকে হু হু হাওয়ায় লোনা ভিজে গন্ধে অলকার অর্ধেক কথাই উড়ে যাচ্ছিল।

—সূর্য···লোকে আসত, সমুদ্রের···দিয়ে,···শো বছর আগে··· গো গাড়িতে···'আমার এ ঘর বহু যতন করে', ধুতে হবে মুছতে হবে ···সূর্য···

আমি অলকার হাত ধরে রাখতে পারছিলাম না। এত বেগে হাঁটছিল অলকা, প্রায় ছুটছিল···

হঠাৎ অলকা দুহাত তুলে বলে উঠল,

—সমুদ্র! সমুদ্র!

অলকা আমার হাত থেকে প্রায় নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে ছড়ানো বীচের ওপর ছুটতে ছুটতে চলে গেল সমুদ্রের দিকে। আমি স্থির

হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম আমার সামনে দিগন্তে, জ্যোৎস্নার রূপোলী জালে বন্দী সমুদ্র ঝিলিক দিয়ে উঠছে। শাদা বালিয়াড়ি যেন ঢালু হয়ে সেই দিগন্তজোড়া অতিকায় কালো রূপালী পাইথনের পিঠের তলায় ঢুকে গেছে। আমি দেখলাম অলকা তার কাঁধ থেকে খসিয়ে দিল তার ঝোলা। বালিয়াড়িতে পড়ে রইল সেটা অন্ধকার স্তূপের মতো। আরো খানিক দূর এগিয়ে অলকা ফেলে দিল তার জলের ফ্লাস্ক।

আস্তে আস্তে সমস্ত দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে যেন স্লো-মোশান পিকচারের ছবির মতো হয়ে গেল। আমি দূর থেকে দেখতে লাগলাম বালিয়াড়ির ওপর সেই জ্যোৎস্নার উপচে পড়া প্রপাতের মধ্যে অলকা যেন এক অপার্থিব ব্যালে ড্যান্সারের মতো তার কোমরের চওড়া বেল্ট আলগা করে দিয়ে, আস্তে আস্তে তার জীনস্ নামিয়ে দিচ্ছে, ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে তার বোতামহীন ভি-কলারের শার্ট।

সমস্ত ঘটনাটা আমার কাছে কিন্তু একটুও অস্বাভাবিক কিংবা দৃষ্টিকটু লাগছিল না। কি আশ্চর্য, মনে হচ্ছিল, যেন সমুদ্র সামনে এলে এই ভাবেই, চাঁদের ধূ ধূ নীয়ন আলোর তলায় নিজেকে নিরাবরণ করে দিতে হয়, নিবেদন করে দিতে হয়।

আমি দেখলাম অলকার আশ্চর্য স্ট্রীম লাইনড্ হাল্কা শরীরটা যেন ভেসে ভেসে সেই দুলতে থাকা থরো থরো কালো সমুদ্রের গ্রাসের দিকে চলে যেতে থাকল।

আমার বুকের গরাদ ধরে রক্ত মাখা হৃৎপিণ্ডটা আতঙ্কে দুলছিল। আমি একবার হাত তুললাম। বলতে চেষ্টা করলাম,

—অলকা সমুদ্রে ওভাবে যেও না। ও সমুদ্র অজানা। কিন্তু বুঝতে পারলাম আমার মুখে কোনো নিষেধাজ্ঞাই মানায় না। আমি ত সমুদ্রের বুকের কাছে চলে যেতে পারি নি, ওর লোনা জল ছুঁতে পারি নি। আমাকে ত ওসব কোনো কথাই মানায় না। আমি পাজামার দড়ি,

কিংবা পাঞ্জাবির একটি বোতামও ত খুলতে পারি নি। সমুদ্রে স্নান করা দূরে থাক সমুদ্রের কাছাকাছিও যেতে পারি নি।

আমি কোন অধিকারে অলকাকে বারণ করব? বরং অলকা যদি আণ্ডার কারেন্টের শিকার হয়, হাঙরে ওকে ধারাল দাঁতে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেয় আমি জানব অলকা ঠিক অলকার মতো করেই মরে গেছে।

আস্তে আস্তে আমি বালিয়াড়ির ওপর বসে পড়লাম। ওই ভাবে বসে থাকতে থাকতে শ্রান্তিতে নেশায় আমি কেমন যেন স্বপ্নের ভিতরে ভিতরে চলে যেতে থাকলাম। অলকা সমুদ্রের ঢেউএর ভেঙে পড়া শাদা ফেনার ওপারে কোথায় যে তলিয়ে গিয়েছিল তা আমি বুঝতে পারি নি। কতকাল বাদে যে আবার সমুদ্রের আগ্রাসী মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল, তাও না। ঝাপ্‌সা চোখে আমি দেখলাম অলকা তার খোলা চুল থেকে নিঙড়ে ফেলে দিচ্ছে বাড়তি জলের ধারা। অলকা কি আমাকে আমার অস্তিত্বকে ভুলে গেল? কে জানে? না হলে আমার কাছাকাছি ফিরে না এসে সেই ওই দূরে বালির মধ্যে ক্লান্ত শরীর বিছিয়ে দিয়ে এলিয়ে শুয়ে পড়ল কেন?

দূরের সেই জ্যোৎস্নাভেজা অলকাকে দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে আমার দুচোখ বন্ধ হয়ে এলো। আমি কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম তা আমি নিজেই জানি না। কখন্ সকাল হয়েছে আমি জানি না। অলকার ঝাঁকানিতে আমার ঘুম ভাঙলো। আমি চোখ মেলতে চেষ্টা করলাম। ঠাণ্ডায় চোখ ফুলে গিয়ে চোখ চাইতে কষ্ট হচ্ছিল আমার। গলা শ্লেষ্মায় ভারী। অলকা হাঁটু মুড়ে বসে আছে আমার পাশে। তার বালিমাখা চুল আর পোশাকে সে কিন্তু ঝরঝরে সুন্দর টাট্‌কা।

—এই সূর্য ওঠো, চলো রেস্ট হাউসে ফিরবে না?

আমি হঠাৎ অলকার দু'কাঁধ ধরে, রুমাকে ভুলে গিয়ে, আমার বাজে চাকরিটার কথা ভুলে গিয়ে বললাম,

—অলকা, তুমি আমায় বিয়ে করবে?

কথাটা বলেই আমার কেমন যেন ভয় করে উঠেছিল। আমি ভেবেছিলাম অলকা আমার অবান্তর প্রস্তাবে খিলখিল করে হেসে উঠবে। কারণ তার অমন অসাধারণ কণ্ঠসম্পদ, তার বিরাট ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, বম্বের স্টুডিও, উঁচুদরের মানুষদের সঙ্গে তার নানারকম সম্বন্ধ, লেনদেন।

কিন্তু অলকা আমার দিকে কেমন অদ্ভুত করে চাইল। তার চোখদুটিকে মনে হল, ভোরের সমুদ্রতীরে পড়ে থাকা দুটি জলভরা ঝিনুকের মতো আয়ত। একটু ভাঙা অপূর্ব গলায় অলকা বলল,

—কিন্তু সূর্য, আমি যে ওই কোণারকের মন্দিরটার মতো। সূর্য পূজার আগেই অপবিত্র হয়ে গেছি।

আমি তার দু'হাত ধরে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আস্তে আস্তে তাকেই টেনে আনলাম আমার বুকের ভিতর। তার বালিমাখা চুলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বললাম,

—না না না না তুমি অপবিত্র না—

অলকা আর আমি ফিরে এলাম রেস্ট হাউসে। স্নান সেরে আমরা দুজনে মুখ বদলাবার জন্যে চলে গেলাম কোণারকের কাছাকাছি ভাতের দোকানে। শালপাতার থালায় ভাত খেলাম দুজনে। মাছ ভাত ডাল। কত যে সব অর্থহীন গল্প করতে করতে খেলাম আমরা।

ফিরে এলাম রেস্ট হাউসে।

অলকা ওর ঘরে চলে গেল। আমি আমার। খানিক পরে আমি অলকার ঘরে গেলাম। দরজা খোলাই ছিল। অলকা চোখে হাত চাপা দিয়ে বিছানায় শুয়ে। অলকার পরনে হাল্কা ছাপা ভয়েল শাড়ি। ওর একটি পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে আর একটি পায়ের বুড়ো আঙুল খুঁটছিল।

আমি বললাম,

—অলকা, কোনো মানে হয়?

অলকা চোখের পাতা থেকে হাত সরিয়ে হেসে বলল,

—কিসের?

আমি অলকার কাছে এসে ওর হাল্কা শরীরটা তু হাতে তুলে নিলাম। তারপর নির্জন প্যাসেজ দিয়ে ওকে নিয়ে গিয়ে আমার বিছানায় শুইয়ে দিলাম।

আমার বিছানায় স্নাত, পবিত্র, সবুজ কল্কা দেওয়া শাড়িতে মোড়া অলকা যেন পৃথিবীর পবিত্রতম একটি কুমারীর মতো শুয়ে রইল। আমি অলকার হাল্কা হাতের পাতাটি আমার মুঠোর মধ্যে নিয়ে তাকে তুপুরের হলুদ আলোয় মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম।

অলকার নিমীলিত চেখের সরু কোণটি সামান্য একটু অশ্রুর আভাসে চিক্‌মিক্‌ করে উঠল। সে চাপা গলায় বলল,

—সূর্য আমি ত সেদিন এই স্বপ্নই দেখেছিলাম। চৌধুরীর ফ্ল্যাটের প্রথম রাত্রে। ঠিক এই স্বপ্ন। যেন তোমার কাছে, তোমার পাশে, তোমার সঙ্গে···যেন তোমার হাত ধরে চলে যাচ্ছি। হাওয়ায় আমার চুল উড়ছে, আঁচল উড়ছে, মাটিতে পা পড়ছে কি পড়ছে না!

অলকার মুখটি আমার তু-হাতের অঞ্জলিতে তুলে নিয়ে, যেন তার চেয়ে অনেক বেশি বয়স্ক হয়ে গিয়ে আমি বলেছিলাম,

—অলকা মাঝের দিনগুলো আমি মুছে দেব, ধুয়ে দেব, কোনো দাগ থাকবে না। দেখো!

—তা হয় না সূর্য!

আমি বলেছিলাম,—দেখবে, হয়,

আমার তুটো ঠোঁট যেন ঘষে ঘষে তুলে দিতে চেয়েছিল অলকার সব মলিনতা।

আমি অলকার কাছ থেকে অলকার শরীর ভরা নতুন কৌমার্য প্রার্থনা করলাম। অলকা আমাকে তার শরীরের সমস্ত বন্ধ মুকুলগুলি নিঃশেষে ফুটিয়ে দিতে দিল।

অলকার সঙ্গে পরদিন আমি পুরী চলে গেলাম। পুরীতে গিয়ে আমার কলকাতায় ফেরার টিকিটটা কখন যেন ফেলে দিলাম পথের ধারে। আমার কলেজে বাড়তি ছুটির দরখাস্ত পাঠাতেও ভুলে গেলাম। রুমাকেও কোনো খবর দেওয়ার কথা স্মরণে রইল না। পুরীতে অলকার ট্রাঙ্ক্‌কল এল। জরুরী ডাক। তাকে দুদিনের মধ্যে বম্বে যেতেই হবে।

অলকার সঙ্গে আমি গেলাম তাকে ভুবনেশ্বরের এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে তুলে দিতে। সেখানেও আমাদের একসঙ্গে কেটে গেল একটি দিন আর একটি রাত। আমরা দুজন সারা দিন রাত কাটালাম হোটেলের একটি বন্ধ দুয়ার ঘরে। অলকা পরদিনই উড়ে যাবে বম্বে। তারপর সেখান থেকে আমাকে ট্রাঙ্ক্‌কল করবে। তার কল্ পেলেই আমি চলে যাবো বম্বে। আমরা বিয়ে করব।

বম্বে চলে যাবার পর অলকার ট্রাঙ্ক্‌কল এল রাতে। কত শত মাইল দূর থেকে ভেসে ভেসে পৌঁছোল তার সেই আশ্চর্য বৈদেহী কণ্ঠস্বর,

—সূর্য, আমি কালই বাইরে চলে যাচ্ছি। তিন মাস বাদে ফিরব। তুমি মেদিনীপুরে ফিরে যাও। আমি চিঠিতে সব জানাচ্ছি।

আমি কলকাতায় ফিরে এলাম। ফার্স্ট ক্লাশে।

রুমা খবর পেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। একটু বৃষ্টি হয়েছিল বোধহয়। তাই রুমার পরণে রঙ্‌জ্বলা সস্তা নাইলন। খুব হিসেবী মেয়ে রুমা। আমাদের প্রেমহীন ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনে আর যাই থাকুক শরীরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের যে বিশেষ ঘাটতি থাকবে না তা বুঝে ফেলেছিলাম। কিন্তু রুমাকে কোনো মিথ্যে কথা বলে ভাঁওতা দিতে আর ইচ্ছে করছিল না আমার। সে জিজ্ঞেস করেছিল,

—যেদিন আসার কথা সেদিন এলে না কেন?

—অলকার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল আমার।

রুমা একটু চম্‌কে উঠে বলেছিল,

—কে অলকা?

—তুমি চিনবে না।

—টিকিট-এর টাকাটা ত নষ্ট হল।

—হল।

—ব্ল্যাকে টিকিট কাটলে ত?

—নাঃ ফার্স্ট ক্লাশে এলাম।

রুমা একেবারে আঁতকে উঠল।

—শুধু শুধু ফার্স্ট ক্লাশ? ওই বাড়তি টাকায় একজোড়া ভালো তোষক হয়ে যেত!

আমি হেসে বলেছিলাম,

—সত্যি রুমা তুমি খুব গুছুনে মেয়ে হবে, খুব ভালো বৌ, ভাবছি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেবার সময় এসে গেছে। আমি তোমার ঠিক যোগ্য নই। আমার চেয়ে ভালো কোনো পাত্রের সঙ্গে তোমার বিয়েটা দিয়েই ফেলতে হচ্ছে!

আমি লক্ষ্য করেছিলাম, রুমার ঠোঁট কাঁপছে। হতাশায় দুঃখে ওর মুখের রঙ পাঙাশ।

কাঁপা গলায় ও বলেছিল,

—তুমি কি আমায় ঠাট্টা করছ সূর্য?

আমার কেমন যেন ঘেন্না হয়েছিল। যেদিন রাজধানী এক্সপ্রেসে চড়ে রুমা আমাকে ছেড়ে চলে যায়, সেদিন প্ল্যাটফর্মে আমাকে যেমন পোশাকের ওপর ছারপোকার মতো রুমার দারুণ বাড়তি লেগেছিল, তেমনি সেদিন রুমাকেও আমার এত অতিরিক্ত, অধিকন্তু মনে হল।

আমি চাপা গলায় কেটে কেটে বলেছিলাম,

—না ঠাট্টা নয়। আমি ভেবে দেখেছি আমরা কেউ কারো যোগ্য নই রুমা। আমি কাল মেদিনীপুরে চলে যাচ্ছি। তুমি তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

মেদিনীপুরে পৌঁছেই অলকার প্রথম চিঠি পেলাম।

সূর্য,

আমার এ চিঠি যখন পাবে তখন আমি সুইজারল্যাণ্ডে। বম্বে ফিরেই একটা দারুণ ভালো কনট্রাক্ট পেয়েছি। এক বিদেশী হিরোয়িনের কণ্ঠস্বর আমার গলায় ডাবড্ হবে। ও বিদেশী নায়িকা। ভারতে আসবে না। ছবির অনেকটাই তোলা হবে সুইজারল্যাণ্ডে। সুতরাং আমাকেই চলে যেতে হচ্ছে। হোক। তোমাকে চুপিচুপি বলি এটাই আমার শেষ কনট্রাক্ট। একটা ফ্যাবুলাস টাকা পাচ্ছি। কার জন্যে পাচ্ছি, কে আমার 'লাক্' সূর্য তা তুমি নিজেও জানো না। আমি তোমায় পরে জানাবো। আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী দীক্ষিত আমার সঙ্গে যাচ্ছে। ও ফিরে এসেই আমার বম্বের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলবে। যেটুকু থাকবে দীক্ষিতকেই দিয়ে যাবো। তারপর আমি আর কিছু ভাবব না, কিছু বলব না সব ভার সব দায়িত্ব তোমার। তুমি যা বলবে, তুমি যা চাইবে তাই।—তাই হবে। চিঠি দিও। না হলে কি নিয়ে থাকব।

অলকা

অলকার দ্বিতীয় চিঠি এলো পরদিনই।

সূর্য,

আমি তোমার।

সত্যি বলতে কি সূর্য, তুমি আমায় কোণারকের সেই বালিয়াড়ির সকালবেলা সমুদ্রের বুকের ওপর থেকে লাফিয়ে উঠা লাল বলের মতো সূর্য দিয়েছিল। সেদিন থেকে সব আগামী দিনগুলো দেখোতো কি ভাবে বদলে গেল?

মনে আছে সেদিন দুপুরের রেস্ট্ হাউসে, পুরীতে, ভুবনেশ্বরের হোটেলে তুমি বার বার আমাকে কি বলেছিলে?

—শরীর ত মন্দির নয়। মন্দিরের চেয়ে অনেক অনেক বড়। তা কখনও অপবিত্র হয় না। বলেছিলে তোমার গড়া অলকা,—কুমারী। সূর্য আমি তাই হয়ে গেছি। একেবারে নতুন। আলাদা একটা

অলকা। আমি ত জানতাম না সূর্য এমনটা হবে। আমার জীবনেও কোনোদিন চারদিক আলোয় আলোময় করে সূর্য উঠবে।

সূর্য, সূর্য, ইচ্ছে করছে তোমার গলার স্বর শুনি। হাতের কাছে ফোন। তুলে ওভারসীজ লাইন বুক্ করলেই হল। কিন্তু তোমার ওখানে কি কোনো ফোন আছে?

প্রায় দু তিনদিন অন্তর অন্তরই আমি অলকার চিঠি পেতাম। আশ্চর্য সুন্দর সব চিঠি। কবিতার মতো সুন্দর। আন্তরিক।

সবশেষে পেলাম চমৎকার একটি রঙীন কার্ড।

ফিকে হলুদ তার রঙ্। তাতে ফেল্ট পেনে অপূর্ব একটি সবুজে শুধু লেখা,

সূর্য,

আমাদের দুজনের নিশ্চয় একটি সুন্দর ফুটফুটে······কি হবে সূর্য? ছেলে না মেয়ে?

অলকা

এবং তারপরই দীক্ষিতের টেলিগ্রাম। আমাকে এয়ারপোর্টে আসতে বলেছে। অলকা সোজা কলকাতায় নামতে চায়। পার্ক হোটেলে একটা স্যুট্ বুক্ করে রাখতে হবে আমাকে।

আমি মেদিনীপুর থেকে দীর্ঘ ছুটি নিয়ে কলকাতায় চলে এলাম। আমার সারা মন শুধু অলকার কথায় অলকার চিঠির সুরে ভরা। পার্ক হোটেলের সবচেয়ে দামী একটা স্যুট বুক করে আমি চলে গেলাম এয়ারপোর্টে। অলকা আর দীক্ষিত নামল।

অলকার পরনে হলুদ রঙের স্লাকস্ আর ব্লাউজ। অলকা আরও রোগা হয়েছে আর স্বচ্ছ। দীক্ষিতের সঙ্গে আমরা এয়ারপোর্টেই অপেক্ষা করলাম। অলকার প্রাইভেট সেক্রেটারী। ও কলকাতায় থামছে না। সোজা বম্বে চলে যাচ্ছে। ওর প্লেন ঘণ্টা খানেক পরে।

আমরা কফি লাউঞ্জে বসে কফি খেলাম।

দীক্ষিত দেখতে এত সুন্দর। বার বার আমার চোখ চলে যাচ্ছিল ওর সুন্দর মুখের দিকে। দীর্ঘদেহী পরুষ চেহারা। একেবারে খোদাই করা মুখ। গায়ের রঙ একেবারে ফেটে পড়ছে। অলকার সঙ্গে অনেক দিন আছে। ওদের প্রথম আলাপের কাহিনীও নানান কথার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এল। আমাকে 'ভাই-সাহেব' বলে ডাকছিল দীক্ষিত।

দীক্ষিত বম্বেতে এসেছিল সিনেমায় 'হীরো' বনবার জন্য। আসার সময় বাবাকে না বলে নিয়ে এসেছিল বেশ কয়েক'শ টাকা। কিন্তু যা শেষ পর্যন্ত হয়, ওর ক্যামেরা ফেস্ যদিওবা রাজেশ খান্নার মতো একটু একটু এল, ওর কণ্ঠস্বর একেবারেই মাইক ফিটিং হল না। তখন বম্বের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল দীক্ষিত। হাতে পয়সা নেই। হোটেল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। খাবার পয়সাও নেই। হীরো হবার জন্য যে সব রঙচঙে শার্ট কিনেছিল তা একটা একটা করে প্রায় সবই বিক্রি করে ফেলেছিল। এই সময় অলকাও চরকির মতো ঘুরত তার ছোট্ট ইটালিয়ান গাড়িটা নিয়ে। ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির ক্লীক্ ভেঙে সেও ঢোকার চেষ্টা করছিল। সেই সময় অলকার সঙ্গে একটা সস্তা রেস্তোরাঁয় আলাপ হয়ে যায় দীক্ষিতের। সুখে দুঃখে একসঙ্গে থাকতে থাকতে দুজনে এই বিরাট ব্যবসা গড়ে তুলেছিল। দীক্ষিত ঠিক অলকার মাইনে করা চাকর নয়। আরো অনেক বেশি। সেই অতদিনের বন্ধু আর সঙ্গী আর পরিবেশ ছেড়ে অলকা চলে আসছে। সেই কথাই আমাদের মধ্যে হচ্ছিল।

দীক্ষিতের চোখদুটি বিষাদময়। সে সাহিত্যিক নয়, আমাদের মতো কথা-সর্বস্ব বাঙালীও নয়, যে সুন্দর করে মনের ভাব প্রকাশ করে বলবে। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম তার কষ্ট। প্লেনে উঠবার আগে দুহাত দিয়ে আমার হাত দুখানি ধরে বলে গেল,

—ভাই সাহেব, অলকা আপনাকে যে কত ভালোবাসে, তা

অলকা হয়ত নিজেই জানে না। ও অনেক দুঃখ পেয়েছে। এখন সুখ ওর পাওনা। আপনি অলকাকে দেখবেন।

আমরা দুজনে দীর্ঘ যাত্রায় দমদম থেকে সিধে চলে এলাম পার্ক হোটেলের স্যুটে। বিয়ের নোটিশ দিতে দিতে দিন তিনেক গেল। সে ক'দিন আমি আর অলকা যে কি করেছি তার হিসেব-নিকেশ একেবারেই নেই। সারা কলকাতা ঘুরেছি বাসের দোতলায় উঠে পাশাপাশি সীটে বসে, শহরতলির উপকণ্ঠে চলে গেছি কোনো জনহীন ধানক্ষেতের কাছে, কলকাতার অলিগলি আবিষ্কার করেছি ঘুরে ঘুরে। আবার সবচেয়ে দামী রেস্তোরাঁয় ডিনার খেয়েছি। ক্যাবারে দেখেছি বারে বারে ঘুরেছি। এমনকি কালীঘাটেও ঘুরেছি।

তারপর একদিন চুপচাপ দুজন অর্ধপরিচিত বন্ধুর সাক্ষীতে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পরে বন্ধু দুজনকে খানিকটা খাওয়ানো দাওয়ানোর ব্যাপার ছিল। কিন্তু তাদের আমরা আমাদের আস্তানার ঠিকানা জানাতে চাই নি। তাই কলকাতার একটা মাঝারি দামী রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়েছিলাম। খাবারের অর্ডার দিয়ে বসেছি একটা কেবিনে, বলাই বাহুল্য আমি আর অলকা একেবারেই নিজেদের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলাম অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম, তখনই কেবিনের দরজা খুলে উঁকি দিল রুমা।

—সূর্য !

আমি চম্‌কে উঠে দাঁড়ালাম। অলকাও উঠে দাঁড়াল।

আমি অলকাকে বললাম,

—তুমি বস অলকা আমি দেখছি !

বাইরে এসে রুমাকে নিয়ে আমি রাস্তায় নামলাম। আমরা দুজন সেই জনবহুল অপরাহ্নে যখন মুখোমুখি দাঁড়ালাম তখন রুমার মুখে অপরাহ্নের আলো পড়েছে। রুমা খুব চেষ্টা করছিল তার গালের শুকনো ক্ষতচিহ্নটা লুকিয়ে রাখতে কিন্তু পারছিল না।

রুমা বলল,

—তোমায় দেখলাম গাড়ি থেকে দলবল নিয়ে নামছ। এখানে ঢুকলে। আমি বাসে যাচ্ছিলাম।

আমি বললাম,

—নামলে কেন?

—তুমি কলকাতায় এসেছ আমাকে খবর দাওনি!

রুমা আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম,

—কি হবে খবর দিয়ে, রুমা আমি ত তোমায় বলে দিয়েছি তোমার দেখাশোনা করার দায়িত্ব নিশ্চয়ই আমার। আমি মাসিমার কথা রাখবই। কিন্তু আমার নিজের প্রতিও ত কিছু দায়িত্ব পালন করতে হবে আমাকে?

রুমা শান্ত গলায় বলল,

—ওই মেয়েটিই কি সেই অলকা?

—হ্যাঁ, রুমা আমাদের আজ রেজেস্ট্রী হয়ে গেল!

রুমা পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অদ্ভুত হেসে বলল,

—কিন্তু অলকার যে পরিচয় আমি জানি তাতে তোমায় অভিনন্দন জানাতে পারলাম না সূর্য। আচ্ছা, আমি যাই!

আমি ফিরে এলাম। টেবিলে তখন অলকাদের দারুণ জমাটি আড্ডা। অলকা বলল,

—এসো সূর্য, এসো, শোনো মিঃ কাপুর কি বলছেন?

আমি দেখলাম অলকার মুখ আনন্দোজ্জ্বল প্রশান্ত। এক ফোঁটাও মেঘলা ছায়া নেই কোথাও। আমার নিজের ভিতর একটা ঘোর অস্বস্তি তোলপাড় করতে লাগল। আশ্চর্য, রুমাকে যে রকম, স্পষ্ট ভাবে অলকার কথা বলতে পেরেছিলাম অলকাকে কেন তেমন খোলাখুলি রুমার কথা বলতে পারি নি। রুমার সঙ্গে কথা বলায়

কোনো মালিন্য ছিল না, কোনো অন্যায় বা দোষও ছিল না। তবু কেন রুমার কথা অলকার কাছে বলতে আমার এত বেধে গেল?

ডিনারের পর আমরা দুজন বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলাম একটা দামী বারে। নরম কার্পেটে আমাদের পায়ের পাতা বসে বসে যাচ্ছিল। প্রায়ান্ধকার ঘর। ঘরে লাল্‌চে আগুনের আভার মতো লুকোনো আলো। আমরা দুজনে সামনাসামনি বসলাম। অলকা নিল একটা ভারমুথ আর আমি একটা হুইস্কি। অলকার সুকুমার কাঁধের গড়নটি, গ্রীবাটি, অসমতল গালের একপাশে লালচে আভা, ঢেউ খেলানো, কাঁধ ছাপিয়ে নামা চুলের কিনারাগুলো তামার তারের মতো ঝকমক করছে। অন্ধকার মুহূর্তের জন্য আলোকিত করে অলকা তার সিগারেটটা ধরাল। ধোঁয়ার মৃদু কুণ্ডলীগুলো ওপরে উঠে ভেঙে ভেঙে মিশে যাচ্ছিল। অলকা তার উষ্ণ আঙুলগুলো আমার হাতের ওপর রেখে বলল,

—সূর্য, আমি কিন্তু ভাবিই নি, আমি কোনোদিন এত সুখী হব।

আমার চোখ উপ্‌চে খানিকটা জ্বালা আর একটু জলও এল। বললাম,

—অলকা আমি কিন্তু ভারি অপরাধী বোধ করছি।

—কেন সূর্য?

—তুমি তো আমায় জিজ্ঞেস করলে না রুমা কে?

অলকা হাসল।

—সূর্য এ ব্যাপারে তুমি নভিস্, অনভিজ্ঞ, আমি যে অনেকদূর অনেকখানি জেনে ফেলেছি। অন্তত ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক আমাকে যে জানতে হয়েছে। তোমার তো শুধু ওই রুমা না কি, আর আমার! তুমি যে সহ্য করতে পারবে না সূর্য, তাই আমি বলি না। বলি নি। আমারও কি কম ইতিহাস! কিন্তু সূর্য আমার কেমন যেন মনে হয় জীবনে সব ব্যাপারেই অভিজ্ঞতা ভালো। কাজ দেয়।

একমাত্র এই একটি বিষয়ে যত কম জানাজানি হয়, যত কম বলাবলি, ততই ভালো।

আমি তবু অলকাকে সব বললাম। মনে হল, না বললে আমার মুক্তি নেই। মাসিমার কথা, রুমার সঙ্গে আমার সেই উনিশ বছর বয়সের প্রথম ভালো লাগার দিনগুলোর কথা, রুমার বাবার কথা, রুমার কলকাতায় আসার কথা, সব।

সব শুনে অলকা একটা গভীর আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর ভারমুখে চুমুক দিতে দিতে বলল,

—আমরা রুমার ভালো বিয়ে দেব সূর্য! কিন্তু আজ রুমার কথা থাক্। রুমার চেয়ে তোমার মাসিমার জন্য আমার বড় দুঃখ লাগছে। ...কিন্তু সূর্য আজ তোমার মাসিমার কথাও থাক্। আজ সূর্য, আফটার অল আজ থেকে আমরা ম্যান্ এ্যাণ্ড্ উওম্যান, স্বামী-স্ত্রী। তাই না?

—আর আজ আমাদের ফুলশয্যা তাই না?

আমি অলকার মুখের কাছে আমার মুখ সরিয়ে আনলাম। ওর সামান্য নিকোটিন লাঞ্ছিত লম্বা লম্বা আঙুলের ভাঁজে ছিল তন্বী একটি সিগারেট। তার সোনালী টিপ্ ওর ঠোঁটে। তার আলোয় ওর সারামুখ তামার পাত্রের মতো ঝকমক করে উঠল। অলকা বলল,

—আমি তোমার কথায় সত্যিই আজ কুমারী হয়ে গেছি সূর্য। সত্যিই কুমারী। কি আশ্চর্য না। অথচ আমার শরীরে তোমার দেওয়া মুক্তোই ত ক্রমশ নিটোল হয়ে উঠছে।

আমরা সেদিন সেই অর্ধজ্ঞান আর অর্ধস্বপ্নের মধ্যে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত একটা ফিটনে চড়ে সারা ময়দান ঘুরেছিলাম। অলকার পরনে ছিল খুব মূল্যবান একটি বেনারসী শাড়ি। নাম জানি না, দাম জানি না এমন অনেক বহুমূল্য গয়না। কিন্তু সব ছাপিয়ে উঠেছিল ওর মাথার চুলের পাশে ঝাপ্টার মতো করে লাগান বেলফুলের মোটা গোড়ে। সে যে কি গন্ধ, তা আমি আজও মনে করতে পারি।

হোটেলে ফিরে এসে অলকা আর আমি প্রায় লজ্জায় লুকোতে পারলে বাঁচি। সারা করিডোর আর আমাদের স্যুট্ ফুলে ফুলে ভর্তি। কত 'বোকে' কত ফুলের ঝাড় সে আমি গুণতেও পারি নি। অলকার কলকাতার বন্ধু-বান্ধব শুধু নয় বম্বে এবং দিল্লীরও বহু শুভার্থী আর ফ্যান কলকাতার ফুলের দোকানে অর্ডার দিয়ে ফুল পাঠিয়েছে।

অলকা ঝুঁকে পড়ে দু'একটা কার্ডের নামও পড়ল। বেশ বেসামাল হয়ে পড়েছিল অলকা। হয়ত মদের পরিমাণ একটু বেশী হয়ে গিয়ে থাকবে।

—আচ্ছা! সুবীর, চৌধুরীসাহেব, বেরা, হালদার, মিঃ চোপ্‌রা,—ডু ইয়ু নো সূর্য, দে আর অল্ মাই এক্স লাভার্স এ্যাণ্ড···

আমি বললাম,

—ওকথা থাক অলকা। একটু আগেই তুমি বলছিলে না, সব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা ভালো, এই একটা ব্যাপারে না। তুমি যখন কুমারী ছিলে না, আমার বৌ ছিলে না, তখনকার কথা আমি একেবারেই জানতে চাই না। আমার কষ্ট হয় অলকা।

অলকা হাসল। তারপর আমার হাতে হাত গলিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল,

—ইয়েস, ইয়ু আর রাইট্ সূর্য, ইয়ু আর রাইট।

হঠাৎ সেই সুন্দরী সুবেশা দামী মেয়েটির পাশে হাঁটতে হাঁটতে মনে হল আমি যেন কুইন এলিজাবেথের পাশে পাশে নেহাতই ফিলিপ্ মাউন্টব্যাটেনের মতো হেঁটে যাচ্ছি।

আমাদের স্যুটের দরজা খুলে দেখলাম সমস্ত ডবল বেড্‌টা ফুলের জালে ঘেরা। ফুলের মশারি। চারিদিকে বড় বড় ভাসে ফুল, দেয়ালে দেয়ালে ঝুলছে মালা। দীর্ঘ দীর্ঘ মালা। টেবিলের ওপর একটা কার্ড তাতে লেখা 'টু অল্‌কা এ্যাণ্ড সূরিয় বেস্ট্ উইশেস্'—দীক্ষিত।

অলকা আমার দিকে ফিরে বলল,

—সূর্য ব্যাপারটা বুঝলে এতক্ষণে। দীক্ষিতই সবাইকে খবর

পাঠিয়েছে। আর এই কস্ট্‌লি ডেকরেশন এ সবই ওর আইডিয়া।

চারিদিকে চেয়ে দেখে অলকা বলল,

—তিন-চার হাজার টাকার কম হবে না, ফুলগুলো দেখেছো। যেমনি দামী তেমনি রেয়ার।

আমি লাল কার্পেটের ওপর সাজানো সুখস্পর্শ সোফায় এলিয়ে বসে অলকাকে দেখছিলাম। বেনারসী শাড়ি খুলল অলকা। শাটিনের সায়া আর সংক্ষিপ্ত কাঁচুলি পরা অবস্থায় আস্তে আস্তে খুলল সমস্ত গয়না।

আমি হাসতে হাসতে বললাম,

—এখন তোমার সেই ইচ্ছেটা করছে না অলকা?

—কোন ইচ্ছে?

আমার কাছে পিঠটা এগিয়ে নিয়ে এলো অলকা। হুক্‌গুলো খুলে দিতে দিতে বললাম,

—সেই কোণারকে, পূর্ণিমার রাত্রে যে ইচ্ছে হয়েছিল।

কালো নাইলন-নেটের একটা নেগ্‌লিজি পরতে পরতে অলকা হেসে উঠল, বলল,

—কিন্তু এখানে সমুদ্র কোথায় সূর্য?

আমি বললাম,

—কেন সমুদ্র দেখতে পাচ্ছ না?

আমাদের ঘরে সেদিন ভোররাত পর্যন্ত নীল বেড্‌ লাইট জ্বলেছিল। সমস্ত বিছানাটা হয়ে গিয়েছিল সাটিনের সুখস্পর্শ বালিয়াড়ি। সমস্ত রাত চলেছিল আমাদের মিলিত সমুদ্রস্নান। অলকা আমি আর আমাদের দুজনের তীব্র গভীর ভালোবাসার সেই একত্র শয্যা সেই রাত আমি আজও ভুলতে পারি না। প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি পল আজও কারণে অকারণে সময় অসময়ে আমার সব কাজ সব বাস্তবতাকে ভুলিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়।

কিন্তু সেদিন শেষ রাতে বিশ্রী একটা স্বপ্ন আমার চারপাশে যেন একটা কীটের মতো নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছিল। স্বপ্নটা ফুলের স্বপ্ন। আমাদের চতুর্দিকে ফুল। ওপরে ফুল, তলায় ফুল আশেপাশে কেবল ফুল আর ফুল। ফুলের বোঝা। ফুলগুলো দেখতে অমন সুকুমার হলে কি হবে? ক্রমশ যেন টন টন বোঝার মতো জমছিল আমার ওপর। আমার গলা চেপে আসছিল। বুক দেবে যাচ্ছিল! আর মুখাবয়ব-হীন একদল মানুষ যেন বড় বড় পোস্টার নিয়ে আমার ওপর দিয়ে, আসলে আমায় দেখতে না পেয়ে, আমার ওপরকার ফুলের ওপর দিয়ে যেন তাদের কাঁটাঅলা বুট নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। পোস্টার-গুলো খুব চেনা চেনা। আসলে স্বপ্নেও চিনতে পারছিলাম সেগুলোকে। সেগুলো ফুলের 'বোকে'তে আটকানো কার্ডগুলোরই বড় বড় চেহারা।

ঘুমের মধ্যে ছটফট করে উঠে দেখলাম অলকার একটা হাত বেকায়দায় আমার গলার ওপর পড়ে আছে। আস্তে ওর হাতখানি তুলে দিলাম। অলকা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওর মুখ প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। মাথার খোলা চুলগুলো মুখের ওপর পালট খেয়ে পড়েছে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি সারা ঘরটার দিকে তাকালাম। একটা ময়লাটে আলো চুঁইয়ে পড়েছে ঘরের ভেতর। এয়ারকণ্ডিশনের একটা কৃত্রিম ঠাণ্ডা। গলাচাপা আবহাওয়ায় ফুলের ঘন গন্ধ যেন অসহ্য লাগছিল। সুন্দর ফুলের রাশ যদি ঘাড় গুঁজড়ে পড়ে তাহলে যে কি বীভৎস দেখায়! সমস্ত শরীরে একটা বিশ্রী ক্লান্তি। মুখের ভিতর কাল রাতের ভারমুথ আর হুইস্কি পানের স্বাদ। আর মানসিক হ্যাঙ্-ওভার।

আমি উঠে গিয়ে এয়ারকণ্ডিশনটা বন্ধ করে দিয়ে, কাঁচের স্কাই-লাইটটা খুলে দিলাম। আমি সোজা হয়ে হাঁটতেই পারছিলাম না। মাথাটা ঝিমঝিম্ করছিল। বাথরুমে গিয়ে বেসিনের তলায় মাথাটা খানিকক্ষণ পেতে দিলাম। তারপর চোখে মুখে ঘাড়ে জল দিয়ে,

মুখের ভিতরে ভালো করে জল নিয়ে কুলকুচি করে, ভারী তোয়ালে দিয়ে সব নিঃশেষে মুছে ফেলে ঘরে এলাম।

তবু আমার ভিতরকার বিস্বাদ কিছুতেই কাটছিল না। সোফায় বসে অলকার প্রেজেন্ট করা একটা দামী সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিলাম। সিগারেটটা সত্যিই স্বর্গীয়। কিন্তু আমি ভুলতে পারছিলাম না, স্বর্গীয় হলেও, এটা অলকারই উপহার, আমার কেনা নয়।

ইতিমধ্যে অলকা নড়ে চড়ে উঠল। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম অলকা একটু উপুড় হয়ে বুকে বালিশ দিয়ে আমাকে দেখছে। তার দুচোখে নরম তৃপ্তি আর ঠোঁঠে একটু হাসির আভাস লেগে আছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই অলকা ডাকল,

—এই, এদিকে এস,

আমি সিগারেটে একটা লম্বাটান দিয়ে সেটার অর্ধশরীরের মায়া ত্যাগ করে, এ্যাশ্‌ট্রের মধ্যে সিগারেটটা গুঁজে দিয়ে যন্ত্রচালিতের মতো অলকার কাছে এলাম।

—বল,

অলকা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন একটু চমকে উঠল।

তার কালো নাইলন-নেটের সোনালী কিনারা দেওয়া বড় গলার রাত পোশাকের তলায় উপুড় করা কাপের মতো দুটি স্তনের আভাস।

—কি হয়েছে তোমার সূর্য ?

—ফুলগুলো শুখিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু,—

—যা শুখোবার তা ত শুখিয়ে যাবে সূর্য।

আমি বললাম,

—কিন্তু ওই কার্ডগুলোতো শুখোবে না অলকা। শক্ত বোর্ডে লেখা। আইভরি ফিনিশ্‌ কাগজের ওপর।

অলকা একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি দেখলাম ওর সবুজাভ তারাজ্বলা চোখদুটি একটু যেন বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে।

—আমি অবাক হয়ে নিজেই লক্ষ্য করলাম, আমার গলার স্বর কিরকম যেন খস্‌খসে হয়ে উঠেছে। হয়ত আমার মুখের ভাবেও এমন কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকবে যে অলকা তার সিল্কের লেপটা আস্তে করে পাশে সরিয়ে দিয়ে দীর্ঘ আর সিধে হয়ে উঠে দাঁড়াল। অলকার সেই আশ্চর্য সুন্দর শরীর দেখে আমার সারা দেহ যেন আরো বেশি গনগনে হয়ে জ্বলতে থাকল। এই শরীর, এই শরীর,···আমার মনে হতে লাগল দীক্ষিতের কথা, চৌধুরীর কথা, কাপুরের কথা আরো কত চেনা অচেনা, অলকারই মুখে শোনা পুরুষদের কথা।

আমি বললাম,

—আচ্ছা অলকা দীক্ষিতের সঙ্গে তোমার সত্যি সত্যি কি সম্পর্ক ছিল?

অলকা আমার মুখের ওপর থেকে তার চোখদুটি সরিয়ে নিয়ে নীচু গলায় বলল,

—কোণারকে তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর আর কোনো সম্পর্ক ছিল না সূর্য!

—সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে? দুজনেত কাছাকাছি ছিলে। কিছু ঘটে নি?

—না!

—সত্যি বলছ?

—বলছি।

—দীক্ষিত ছাড়া আর কারো সঙ্গে?

—না।

আমি এত উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিলাম যে লক্ষ্যই করি নি, অলকার গলার স্বর ক্রমশ কঠিন, ক্রমশ পাথরের মতো ঠাণ্ডা আর নিষ্প্রাণ হয়ে আসছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে হাতের সিগারেটটা আমার পায়ের তলায় পিষে অসহিষ্ণু গলায় বললাম,

—তোমার গর্ভের সন্তান, ঠিক আমারই,—মানে ঠিক আমাদেরই ত ?

এতক্ষণ অলকা আমার সবকথারই সধৈর্য উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। এবার আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠল। আমি লক্ষ্য করলাম সে নিজের মুখের ভাঙতে চাওয়া রেখাগুলোকে প্রাণপণে টেনে ধরে রেখে সে বাথরুমের দিকে এগোল।

আমি আবার অসহিষ্ণু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম,

—কি ? উত্তর দিলে না।

অলকা উত্তর দিল না। আমার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। আর আমি বুঝতে পারলাম একজন স্বনামধন্য মহিলার জেলাস্ হাজব্যাণ্ড হবার অভিশাপ ঠিক কি ?

এইতো সবে শুরু। এখনও সমস্ত জীবনটাই ত পড়ে আছে। কাল রাতের সেই স্বপ্ন এখনও আমার মাথার মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলছে। অলকার ওই বহুভোগ্যা অথচ ভোগের ছাপহীন সুন্দর শরীরটা জ্বলছে।

অলকার সঙ্গে যে সব পুরুষরা রাত কাটিয়েছে, তার দেহ উপভোগ করেছে, তাকে ব্যবহার করেছে, তাদের অনেককেই ত আমি জানি।

আমার মাথার ভিতর এখন সেই সব দৃশ্যগুলো ফিরে অভিনীত হতে থাকল। তাদের শরীরের সঙ্গে অলকার শরীর উঃ···

বাথরুমে অনর্গল জলের শব্দ হচ্ছে। বেচারী অলকা। সে তার সব মালিন্য বোধহয় জল দিয়েই ধুয়ে মুছে ফেলতে চাইছে।

অলকা বাথরুম থেকে বেরোল। শান্ত ঠাণ্ডা, অনবদ্য। শাদা ধবধবে সূক্ষ্ম চিকনের কাজ করা শাড়ি পরেছে অলকা। শাদা শর্ট-স্লিভ ব্লাউজ। শরীরে কোনো অলঙ্কার নেই। আমি টেলিফোনে আমাদের ব্রেকফাস্ট আনতে বললাম। অলকা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে রূপোর কারুকাজ করা ব্রাশ দিয়ে তার চুল ব্রাশ করতে বসল।

সিগারেটে টান দিয়ে হাল্কা গলায় আমি বললাম,

—বলো অলকা, আজ কি প্রোগ্রাম ?

অলকা আয়নার ভিতর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল,

—তুমি বিশ্বাস কর না সূর্য? আমার গর্ভে যে এসেছে সে তোমারই সন্তান !

আমি হেসে বললাম,

—ধ্যুৎ ওসব কথা তুমি এখনো মনে রেখেছ ? কাল রাতে এমন একটা স্বপ্ন, ভাবো অলকা, তোমারই পাশে শুয়ে তোমাকে নিয়েই একটা বিশ্রী স্বপ্ন, বলো, আমার মনের মধ্যে কি হয় ? হতে পারে ?

ঠোঁটে লিপস্টিক বুলোতে বুলোতে অলকা বলল,

—স্বপ্ন মানে কি জানো সূর্য, সত্য। এক ধরনের সত্য। মনের তলায়, মনেরও অগোচরে সে সত্যগুলো খচ্‌খচ্‌ করে ফোটে, তারাই ত ঘুমের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, জানো ?

আমি কেমন যেন নার্ভাস হয়ে গেলাম। বললাম,

—এই ছাখো এবার কিন্তু তুমি রাগের কথা বলছ অলকা। এই অলকা অত রাগ করে না।

এই সময়ে দরজায় নক্ হল। আমি আসতে বলতেই তুজন বেয়ারা ঢুকল হেভি ব্রেকফাস্ট নিয়ে।

বেয়ারারা চলে যেতেই আমি অলকার পিছনে বসে ওর তুটো কাঁধ ধরলাম। আয়নায় আমাদের তুজনকে অদ্ভুত দেখাল। অলকা স্নাত সুন্দর পবিত্র। তার কাছে ড্রেসিং গাউন পরা গালে একদিনের দাড়ি উস্কোখুস্কো চুল, আমি যেন কেমন একটা মোটা দাগের স্থূল পুরুষ। আয়নার মধ্যে দিয়েই চোখাচোখি হল আমাদের। অলকা কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল।

আমি বললাম,

—এসো খাবে এস,

সামনাসামনি বসে বিস্বাদ হয়ে যাওয়া টোস্ট্‌ মাখন খেলাম।

অলকা প্রায় কিছুই খেল না। ডিম না ফল না, বেকন না কর্ণফ্লেক্‌স না, ফিশ এ্যাণ্ড্‌ চীপ্‌স না। তারপর নিজের ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে, শূন্যে তাকিয়ে বলল,

—আমি একটু বেরোচ্ছি।

আমি বলতে গেলাম কোথায় যাচ্ছ?

তার আগেই সে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার স্ত্রী অলকা আমার চেয়ে অনেকগুণ ধনী, নামজাদা আর প্রতিভাময়ী। এবং আমার স্ত্রী বেশ সর্বজনবিদিত দুশ্চরিত্রা।

বিছানায় গড়িয়ে পড়ে আমি অলকার দেওয়া সিগারেটের টিন থেকে একটা সিগারেট ধরাতে বাধ্য হলাম। আজ আমার আর অলকার পার্ক স্ট্রীটের মাঝামাঝি জায়গায় গড়ে ওঠা একটা মাল্টি-স্টোরিড্‌ এ্যাপার্টমেন্ট্‌ হাউস দেখতে যাবার কথা ছিল। আমরা প্ল্যান দেখে এসেছি। বাড়িটা উঠছে তরতর করে। অলকা চায় টপ্‌ ফ্লোর। অর্থাৎ বাইশ তলার এ্যাপার্টমেন্ট। খুব ছড়ানো ছিটোনো বড় বড় ঘর। বাথরুম কিচেন ডাইনিঙএর আধুনিকতম ব্যবস্থা। প্রত্যেক ফ্ল্যাটের সঙ্গে ফ্ল্যাটের নিজস্ব জেনারেটার। ছাদে সুইমিঙ্‌ পুল্‌। অলকা চেয়েছিল শোবার ঘর আর বসবার ঘরের জন্য কতকগুলো নিজস্ব সাজেসন দিতে। এ ছাড়াও কলকাতায় একটা ব্যবসা আরম্ভ করার কথাও ভাবছিলাম আমরা। সে বিষয়েও আজ থেকেই প্ল্যান করে বিভিন্ন অফিসিয়াল আর ভি. আই. পি-দের সঙ্গে আমাদের দেখা করার কথা ছিল। তাছাড়া পার্ক হোটেলে আর কতদিন থাকা যায়। একটা ভাড়া করে থাকার ভালো বাড়ির কথাও ভাবা হচ্ছিল।

আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে যন্ত্রণায় এপাশ-ওপাশ করতে লাগলাম। অলকার এই রূপ ত এর আগে কখনও দেখি নি। সম্পূর্ণ অজানা রূপ। অলকা তাহলে যেমন দায়িত্বশীল, যেমন ভাবনা চিন্তা করে চলতে জানে, তেমনি জানে এই ধরণের মুডি হতে, এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খল

হতে! বিছানায় শুয়ে উল্টেপাল্টে আর একবার কফির অর্ডার দিয়ে কফি পান করে, রাজেশ খান্না আর ডিম্পল কাপাডিয়ার সচিত্র বিবাহিত জীবনের ঘটনা পড়েও দেখলাম ঘড়ির কাঁটা মাত্র এক ঘণ্টা এগিয়েছে, এবং অলকা এখনও ফেরে নি। এবার ক্রোধে আমার হাত পা থর থর করে কাঁপতে লাগল। ঘরের মধ্যে আবদ্ধ পশুর মতো পায়চারী করতে করতে আমি ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠতে লাগলাম।

অলকা কোথায় গেল?

অলকার ভালোবাসা আমি জানি, কিন্তু অলকার ক্রোধ ত আমার অজানা।

অলকা কি চৌধুরী সাহেবের বাড়ি গেল?

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল কোণারকের সেই রেস্ট্‌হাউসে রাম্ খেয়ে প্রায় জ্ঞান-হারা সেই উচ্ছৃঙ্খল অলকাকে।

অলকাকে আমি কখনো রাগতে দেখি নি। কিন্তু আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় যেন বলে দিচ্ছিল, রাগলে অলকা পৃথিবীর জঘন্যতম প্রাণীও হয়ে যেতে পারে। আমার ওপর আক্রোশে ক্রোধে অলকা হয়ত, চৌধুরী সাহেবের কাছে সেই চৌরঙ্গীতে কিংবা পার্ক সার্কাসে সেই কাপুরের কাছে, কিংবা কাল যে ফিল্ম্‌-ডিরেক্টর দীপঙ্কর হালদার মস্ত গোলাপের বোকে পাঠিয়েছিল তার কাছেই চলে গেছে।

আমার মাথার ভিতরটা উগ্র ক্রোধে জ্বলছিল। আমি আর ভাবতে পারলাম না। বিছানার হেডবোর্ডের কাছে যে অক্ষত ভারমুখের বোতলটা ছিল, সেটার ছিপি ভেঙে ফেললাম।

সন্ধ্যেবেলা আমার ঘুম ভাঙল। নেশা জড়ানো অশুচি, স্বপ্নে স্বপ্নে কণ্টকিত একটা ঘুম। আমি উঠে দাঁড়ালাম। চারিদিকে তাকালাম। ঠাণ্ডা এয়ারকণ্ডিশন করা পর্দা ঢাকা অন্ধকার। আলো জ্বেলে স্নান করতে গেলাম আমি। স্নান সেরে পোশাক বদলে একবার নীচের

লাউঞ্জে গিয়েও বসলাম। হোটেলের সামনের রাস্তায়ও কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম। কিন্তু এই এতবড় শহরে আমি কোথায় অলকাকে খুঁজতে যাবো। ফুলশয্যার শুভরাত্রির পর স্ত্রী পালিয়ে যাওয়াটাও স্বামীর পক্ষে বিশেষ মর্যাদাজনক নয়।

ঘরে ফিরে এসে দেখলাম রুম-সার্ভিস খুব সুন্দর করে ঘর সাজিয়ে দিয়ে গেছে। পুরানো ফুলের বাসী গন্ধ থেকে রেহাই পেয়ে মনটা ঝরঝরে হয়ে উঠল। কিন্তু কি ভীষণ দুশ্চিন্তা। অলকা নেই, অলকা কোথায়? এ কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল এই কলকাতা শহরে অলকার ত একটা বাপের বাড়িও আছে। আমি অস্থির পায়ে উঠে, দরজা খুলে কি করব কিছু বুঝতে না পেরে লম্বা করিডোরের মুখে এসে দাঁড়ালাম। সামনে সুদীর্ঘ আলোকিত করিডোর। দুপাশে সারি সারি নম্বর লাগানো বন্ধ স্যুট্। মনে হচ্ছিল আমি যেন আকাশ-হীন মৃত্তিকাহীন কোন যান্ত্রিক পাতাল সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে আছি। অনেক দূরে সুড়ঙ্গের শেষতম প্রান্তে লিফটের দরজা। আমি মনস্থির করতে পারছিলাম না। লিফ্‌ট দিয়ে নেমে আবার নীচে চলে যাব কিনা ভাবতে ভাবতেই আমার সামনে লিফ্‌টের আলো জ্বলে উঠল। দরজা খুলে গেল।

দেখলাম বেরিয়ে এল অলকা।

এক পা এগিয়েই দেখলাম অলকা পা ফেলতে গিয়ে টলে উঠছে! দুপাশের দেয়ালে ঠেক্ খেতে খেতে এগুচ্ছিল অলকা। আমার এত ক্রোধ আসছিল যে আমি একবার ভাবলাম ছুটে গিয়ে দুহাতে ওই মাতাল মেয়েটার গলাটা টিপে ধরি। ভীষণ ঘৃণা হচ্ছিল। তবুও অসীম করুণায় ছুটে গিয়ে ধরে ফেললাম অলকাকে।

অলকা আস্তে আস্তে তার ঝুঁকে পড়া ঘাড় তুলে আমার দিকে ফ্যাকাশে হাসল।

তার মুখ সম্পূর্ণ রক্তহীন।

আমি চাপা গলায় বললাম,

—আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় গিয়েছিলে অলকা? খুব ড্রিঙ্ক্ করেছ না?

অলকা ফিস্‌ফিসে গলায় বলল,

—না ড্রিঙ্ক্ করি নি।

আমি বললাম,

—তবে?

—এনাস্থেসিয়ার ঘোর এখনো ভালো করে কাটে নি সূর্য!

আমি বললাম,

—তুমি, তুমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে অলকা?

অলকা আমার কথার কোনো উত্তর দিল না দেখলাম আমার দু-হাতের মধ্যে তার হাল্কা শরীরটা নেতিয়ে পড়েছে।

আমি অলকাকে নিয়ে আমাদের ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। ওর কাছে বসে দেখতে লাগলাম ওর বন্ধ চোখ ম্লান মুখখানি। অলকা যে কত নরম কত দুঃখী অসহায়া তা এই জ্ঞানহারা অবস্থায় সে আর লুকিয়ে রাখতে পারে নি। আমি তার ঠোঁটের কাছে মুখ নামিয়ে মুখের গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করলাম। না লিকার বা স্পিরিটের কোনো গন্ধ নেই। উঠে গিয়ে অলকার হ্যাণ্ডব্যাগ্‌টা দেখলাম। কিছুই নেই। দুচারটে প্রসাধনের সামগ্রী আর খুচরো কটা টাকা ছাড়া। অথচ অলকার সঙ্গে সব সময়েই ক্যাশে, ট্রাভেলার্স চেকে অন্তত দুহাজার টাকা থাকেই। আমার ভিতর কতরকম মন্দ চিন্তা আসতে লাগল। কলকাতা শহরে আজকাল যা কাণ্ডকারখানা ঘটে। বেচারী অলকা কি তারই শিকার হল। খানিকক্ষণ পরে অলকা একটু নড়ে চড়ে উঠল।

আমি আবার অলকার মুখের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বললাম,

—অলকা, তুমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে কেন?

অলকা কেমন অদ্ভুত হেসে বলল,

—হ্যাঁ, সজ্ঞানে সহ্য করা যায় নাকি?

আমি এবার আর্ত চিৎকার করে উঠে বললাম,

—সে কী ? অলকা তুমি কি, কি করেছ ?

অলকা বালিশে মাথাটি গড়িয়ে দিয়ে বলল,

—তুমি যাকে তোমার বলে অবিশ্বাস করেছিলে তাকে ডাক্তার মুখার্জির নার্সিং হোমে নামিয়ে দিয়ে এসেছি।

অলকার মাথাটি আবার ক্লান্তিতে ঝুলে পড়ল। আমি উঠে গিয়ে দূরের একটা ইজিচেয়ারে বজ্রাহতের মতো বসে রইলাম। মুখে যাই-ই বলি না কেন মনে মনে ত তাকে আমি দেখতে চেয়েছিলাম। পেতে চেয়েছিলাম। আমার আর আমার সব কিছু, দেহমন মিলিয়ে মিশিয়ে সে কেমন হয়ে আসে তা দেখার ইচ্ছে আমার মধ্যে ছিলই।

কত রাত জানি না, রাত ভোর হয়ে এসেছিল কিনা জানি না আমি তন্দ্রার মধ্যে শুনলাম কাঁচের টুং টাং শব্দ। অলকা হেডবোর্ডের কাছে রাখা কাচের জগ্ থেকে গড়িয়ে জল খাচ্ছে।

আমি কাছে উঠে গিয়ে বসলাম। অলকা আস্তে আস্তে আমার হাতটি নিজের মুঠোয় নিয়ে আস্তে আস্তে বলল,

—সূর্য তুমি স্রোতের উল্টো দিকে যেতে চেয়েছিলে। আমিও কি রকম বোকার মতো বিশ্বাস করেছিলাম সূর্য, ভেবেছিলাম তুমি পারবে। কিন্তু দেখলে ত যাওয়া যায় না। যাওয়া অত সহজ নয়।

অলকা দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল,

—সূর্য, আমাদের শরীরও ওই মন্দিরের মতো। একবার অপবিত্র হয়ে গেলে, তাতে আর দেবতা আসেন না। একটা না হওয়া শিশুর ভ্রূণের রক্তে তোমার আমার সূর্য-মন্দির, কোণারক অপবিত্র হয়ে রইল সূর্য!

আমি অলকার মুখের একটি পাশ দেখতে পাচ্ছিলাম। ওর চোখের কোল দিয়ে জলের ধারা লম্বা হয়ে গড়িয়ে পড়ছিল।

অলকাকে পঞ্চম বার, সেই আমার শেষবার, দেখি অজন্তায়।

ইতিমধ্যে রুমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। এই বয়সেই আমরা দুজনে গড়িয়ায় বড় চওড়া রাস্তার ওপর যে ছোট্ট ছিমছাম বাগানঅলা বাড়িটি করেছি, তা দেখলে পথচারীদের ঈর্ষার উদ্রেক ত হবেই। আমাদের বাড়িতে আধুনিক কায়দায় তিনটি বড় বড় ঘর। চমৎকার ঢাকা বারান্দা। নীচ থেকে ছাদে উঠে গিয়েছে আবির রঙা বোগেন-ভোলিয়ার ঝাড়।

সন্ধ্যেবেলা যখন বাগানে ইজিচেয়ারে বসে আরাম উপভোগ করি, রুমার তৈরী চায়ে চুমুক দিতে দিতে, আমার প্রিয় কোনো জল-খাবারে কামড় দিতে দিতে ভাবি এত আরাম এত সুখ কি রুমাকে বিয়ে না করলে, জীবনে আর পেতাম। তখনই হঠাৎ বাড়ির সামনে দিয়ে কোনো ছোট্ট ইটালিয়ান গাড়ি পাস্ করে গেলে আমার বুকের ভিতরটা ছ্যাৎ করে উঠত। অলকা গেল নাকি? অলকা যদি যায় যদি জানতে পারে এই বাড়িটা আমারই বাড়ি তাহলে হয়ত একটু বাঁকা হাসি হাসবে।

আমাদের ছেলেটির বয়স এখন এক বছর। রুমার আর আমার ছেলে। ওর নাম রেখেছি অলক। অলকার সঙ্গে আমার তেমনি কথাই ছিল। আমাদের প্রথম ছেলের নাম হবে অলক, মেয়ের সূর্যা। অলকের নাম রাখতে রুমা আমাকে বাধা দেয় নি। সেজন্য সত্যিই রুমাকে আমি মহৎ বলব। সেই ঘটনার পর, অলকা বম্বে চলে যায়। ডিভোর্স পেতেও আমাদের দেরী হয় নি। আমি ডিভোর্স রুখবার জন্যে পাগলের মতো চলে গেছি। অলকার ফ্ল্যাটের সামনে ধর্না দিয়েছি। দীক্ষিতের হাতে পায়ে ধরেছি। সারা ইণ্ডাস্ট্রিতে অলকার নামে যথাসম্ভব স্ক্যাণ্ডেল করেছি কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। তারপর অলকা উধাও হয়ে গিয়েছিল একবছর। সে কোথায় ছিল কেউ জানত না। অনেক পরে

দীক্ষিতের সঙ্গে একবার কলকাতায় দেখা হয়। শুনেছিলাম অলকা গোয়ায় গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে রুমা মেদিনীপুরে আমার কলেজে গিয়ে আমার চাকরিটা কোনো ক্রমে বজায় রাখার চেষ্টা করে। বানিয়ে হাজারো মিথ্যে কথা বলে প্রায় ছমাস আমার ছুটির ব্যবস্থা করে নেয়। রুমাকে তখন আমি সবই বলেছিলাম। আমাদের না আসা প্রথম সন্তানের কথাও।

অলক জন্মাবার মুখে শান্তিতে আরামে নৈশ্চিন্ত্যে যখন আমার সমস্ত বেঁচে থাকাটা শীতের রদ্দুরের মধ্যে হেঁটে যাওয়ার মতো উষ্ণ আর সুখাবহ, তখনই রুমা বলল, অনেক বাড়তি টাকা জমেছে। বেড়ানোর খাতে। সেই টাকায় একটু অজন্তা এলোরা পুণা বম্বে আমেদাবাদ একটা লম্বা ট্যুর করে আসা যাক। আমরা দুজনেই মাপসই আর হিসেবী। বসে বসে সমস্ত প্ল্যান ছকে ফেললাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম ট্যুরে। প্রথমেই গেলাম আমেদাবাদ, রুমার এক জ্যাঠতুতো ভাইএর বাড়ি। তারপর বম্বে। বম্বে থেকে পুণা। পুণা থেকে ঔরঙ্গাবাদ। সেখান থেকে কণ্ডাক্‌টেড্ ট্যুরের বাসে অজন্তা-এলোরা। অজন্তা আমাকে কি মুগ্ধ যে করেছিল! ছোট্ট একটি 'অজান্তা' গ্রাম। এই 'অজান্তা' গ্রামের নাম থেকেই এই জায়গাটার নাম অজন্তা হয়েছে। গভীর বনের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে নামছে পথ। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। বহুদূর থেকে অজন্তার গুহাগুলো ওপরের ছাউনি তুলে ফেললে গর্ত গর্ত পিপঁড়ের বাসার মতো দেখাচ্ছে। সেইসব গুহার সারির সামনে দিয়ে পাহাড়ের ধাপ ধরে থাকে থাকে নীচে নেমে গেছে একটি ঝির্‌ঝিরে ঝরণা। আর ঝরণার শেষ মুখে আছে একটি কুণ্ড। কিংবা বলতে পারি যেন একটা গোল অতিকায় প্রাকৃতিক পাত্র। যার তলায় জল, চারপাশের দেয়ালে সারি সারি গুহা আর গভীর অরণ্য।

অজন্তার গুহাগুলির প্রবেশ সিঁড়ির কাছেও দেখলাম ছোটখাটো দোকান পশার আছে। জমান কোয়ার্টজের ক্রস্টালের কাগজ চাপা, প্রাকৃতিক ছাইদানী আরো কত কি। অজন্তার পরিচিত, অলোকসামান্য

সব গুহাচিত্রের পিক্‌চার পোস্টকার্ড! রুমা যখন অলককে নিয়ে মুগ্ধ হয়ে সেই সব দেখছে আমি তখনই অলকাকে দেখলাম। সরু শাদা সিঁথির তুপাশে লম্বা চুলগুলি পেতে আঁচড়ান। কাঁধের ওপর ফেলা। পরনে ভেলভেটের জোব্বাজাতীয় একটা ঢোলা পোশাক। তাতে দামী শল্‌মার কাজ করা। চোখে গো-গো চশমা। কাঁধে চামড়ার ব্যাগ্‌ ক্যামেরা আর ফ্লাস্ক। অলকা আমাকে দেখছিল না। দেখছিল রুমা আর খোকনকে। স্রোতের মতো সব স্মৃতি এসে আমার মাথার ভিতরের সব হিসেব সব প্ল্যান্‌ বানচাল করে দিতে লাগল। রুমা আর খোকনকে নিয়ে আমি, অলকা আর তার সঙ্গের বিদেশী যুবকটির পিছন পিছন মন্ত্রমুগ্ধের মতো এক গুহা থেকে আর এক গুহায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

অলকা দামী গাইড্‌ নিয়েছিল। গাইড্‌ কি অসাধারণ ভাষায় যে অজন্তার মোহময় বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিল। এই প্রাচীন গুহার লোকাতীত অলৌকিক প্রভাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার সময়-গতি-জীবনের সব বোধ যেন খুলে খুলে সরে সরে গিয়ে আমাকে সমতা থেকে, স্থিতি থেকে সরিয়ে দিচ্ছিল। অলকার তু'একটা আব্‌ছা কথোপকথনে আমি বুঝতে পারছিলাম ওরা তুজনে আমাদের মতো কণ্ডাক্‌টেড্‌ ট্যুরে অজন্তা এলোরার যাবতীয় একদিনে দেখে কাবার করতে আসে নি। ওরা অজন্তার ঠিক বুকের মাঝখানে, ট্যুরিস্ট হোটেলে কয়েকটা দিন কাটিয়ে ভালো করে অজন্তাকে জেনে যেতে চায়।

বহু দূর থেকে আমি অলকাকে দেখছিলাম। মানুষ কখনো কখনো যেমন নিজের স্বপ্নের ভিতরে, নিজের স্বপ্নকে বিচ্ছিন্ন করে, আলাদা করে দেখে। আর মাঝে মাঝে স্বপ্নেরই ভিতরে ওই স্বপ্নকেই কেবলমাত্র অসত্য স্বপ্ন বলে বুঝতে পেরে হিংসেয় জ্বলে ওঠে। আমি সেই চোখেই অলকাকে দেখছিলাম।

অজন্তা গুহার ছবিগুলো মুছে নিয়ে আমার কেবল মনে হচ্ছিল, আমি যখন এলোরা দেখে বাসে করে ফিরে গিয়ে আমাদের ঔরঙ্গা-

বাদের হোটেলের ঘরে আরাম করে শুয়ে থাকব, অলকের জন্য রুমা স্পিরিট্ ল্যাম্পের নীলশিখা জ্বেলে দুধ গরম করে খাওয়াবে, অলকা তখন এই যুবক বিদেশী বন্ধুটিকে নিয়ে নেমে যাবে নীচে অনেক নীচে ওই অজানা ঝরণার জলে, ওই অজন্তা কুণ্ডে। যেন অজন্তা গুহার মধ্যেকার সেই বিখ্যাত বিষাদ ম্লান ব্ল্যাক্ প্রিন্সেসের মতো, সেই কালো নার্সিসাস, সেই কালো রাজকুমারীর মতো। আর হয়ত ঠিক সেই কোণারকের আমার মতো ওই বিদেশী যুবক মুগ্ধ হয়ে দেখবে কালো মুক্তোর মত চিকন সেই নগ্ন মূর্তি, যেন পাথরে খোদাই অলকাকে। আর অলকা ওই জলের মধ্যে নেমে স্নানের মধ্যে দিয়ে নিজেকেই ভালোবাসবে, নিজেকেই পুজো করবে।

এই ভাবনা হঠাৎ আমাকে সাহসী করে তুলল। আমি রুমাকে বললাম,

—রুমা ওই মেয়েটিকে তুমি চিনতে পেরেছ ?

রুমা আমার দিকে একপলক তাকিয়ে বলল,

—না পারলেও, এখন পারছি।

আমি রুমাকে বললাম,

—আমি একবার ওর কাছে যাব রুমা ?

রুমা অলককে বুকের কাছে তুলে নিয়ে বলল,

—যাও, কিন্তু বেশি দেরী কর না। আমাদের ফেরার সময় হয়ে এসেছে, বাস এলোরা যাচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছেড়ে দেবে।

আমি ছুটতে ছুটতে অলকার কাছে গেলাম।

আমাকে দেখে ঘুরে দাঁড়াল অলকা। আচমকা বলল,

—তোমার ছেলে কিন্তু ঠিক তোমারই মতো দেখতে হয়েছে, রুমার মত একদম হয় নি।

আমি হেসে বললাম,

—ওর নাম দিয়েছি অলক !

অলকা কেমন অদ্ভুত সুরে হেসে উঠল।

আমি বললাম,

—আমার চিঠি ত পেয়েছিলে, জবাব দাওনি কেন ?

—কি হতো জবাব দিলে ?

বিদেশী যুবকটি বিশেষ কৌতূহলী নয়। সে আস্তে আস্তে অন্য দেওয়াল-চিত্র দেখবার ছুতো করে দূরে চলে গেল। আমি তাকিয়ে দেখলাম দুপাশে গুহাচিত্রে সেই কতদিনের আঁকা ফ্রেস্কোয় বুদ্ধের জীবনী। দেখলাম অলকার নির্বিকার বিদেশী সঙ্গীর ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া, দেখলাম গুহামুখে আতঙ্কিত রুমা আর তার কোলে নিশ্চিন্ত অলকের ক্ষুদে সিল্যুয়েট। আমি আবার প্রশ্ন করলাম,

—কেন ? কেন তুমি আমার চিঠির উত্তর দিলে না অলকা ?

অলকা হাসল এবার। শান্ত নিরুত্তাপ হাসি।

—সূর্য আমি তোমার চিঠি পড়ে হেসেছি। উত্তর দেব কী ? ও'ত চিঠি নয়। ও শুধু তোমার রাগ। মিছে রাগ। তুমি লিখে-ছিলে রুমা তোমার জীবনের আলো, আর আমি আলেয়া। রুমা প্রেম আর আমি আকর্ষণ—

—এ সব কি বাজে মিথ্যে কথা তুমি লিখেছিলে সূর্য। নিজেকে ভোলানো, মনকে চোখঠারা, ভাবের ঘরে চুরি—অবশ্য এসব তখন তোমার পক্ষে খুব জরুরী ছিল সূর্য।

সেই অন্ধ গুহার মধ্যে আমার দুটো হাত ধরল অলকা। দৈববাণীর মতো উচ্চারিত হল তার কণ্ঠস্বর।

—সূর্য, শোনো, আমি তোমায় ভালোবাসি। আর তুমি আমাকেই ভালোবাসো। কিন্তু কি করব বল, আমাদের ভালোবাসা যে ওই সূর্য দেবতার মূর্তির মতো। মন্দিরের চার দেওয়ালের মধ্যে যার ঠাঁই হয় নি। রোদে পুড়ছে, জলে ভিজছে, প্রকৃতির হাতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে—কিন্তু পুজো পাচ্ছে না, থাকার জন্য একটা মন্দিরও পাচ্ছে না, তবুও সবাই তার ভাস্কর্যে মুগ্ধ হয়ে বলছে আহা ! আহা !

আমি অলকার দিকে তাকিয়ে বললাম,

—সত্যি বলছ অলকা, আমরা দুজনে দুজনকে···

অলকা বলল,

—মাই ডিয়ার সূর্য, আনফরচুনেট্‌লি ইয়েস্‌!

আমি থরথর করে কেঁপে উঠলাম।

স্পষ্ট বুঝতে পারলাম অজন্তার গুহায় ভাতরান্না করা যায় না। পাথরের দেয়ালে পেরেক পুঁতে দিনরাত্রি মাস বছরের হিসেব করা কোনো ক্যালেণ্ডার টাঙানো যায় না। আপনার জনের সঙ্গে পশুর মত মাংসল, মনহীন রমণ করা যায় না।

আমি অলকার হাত থেকে আমার হাত দুটি আস্তে খুলে নিয়ে মনে মনে বললাম, এবার যাই। রুমার কাছে, অলকের কাছে, আমার ধরা বাঁধা জীবনের কাছে। আমার জন্য দূরে রুমা, অলক আর এলোরাগামী বাস অপেক্ষা করে আছে।

অলকাকে আমার সেই শেষ দেখা। সেই গুহামুখে। সেই অদ্ভুত মেঘলা দুপুরে। হাসছে আর হাত নাড়ছে। আর ক্রমশ ছোট হয়ে মিলিয়ে গিয়ে আমার বুকের ভিতর আবার ক্রমশ বড় আর বুকজোড়া হয়ে উঠছে!